বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ
(১৯৪৭-১৯৭১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আসমা জাহান

401306

Dhaka University Library

401306

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

আগস্ট, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম. ফিল. গবেষক আসমা জাহান, আমার তত্ত্বাবধানে 'বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ (১৯৪৭-১৯৭১)' শিরোনামের গবেষণাসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করেছে। এই গবেষণাসন্দর্ভের সম্পূর্ণ অথবা এর কোন অংশ পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি গবেষণাসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

ওয়াকিল আহমদ
১০-৮-০৩
(অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ)
তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

'বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ (১৯৪৭-১৯৭১)'-শীর্ষক আমার গবেষণাকর্মের কেন্দ্রীয় বিষয় উপন্যাস। পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থান ও তার অগ্রযাত্রার শিল্পাঙ্গিক হিসেবে সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে যে নবতর সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকে, সেখান থেকেই বাংলাদেশের উপন্যাসের যাত্রারম্ভ। গবেষণা শিরোনাম অনুসারে বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রতিফলিত শ্রেণীচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই আমার আলোচ্য গবেষণাকর্মের মূল লক্ষ্য। এর সময়কাল ১৯৪৭-১৯৭১ হওয়ায় বিভাগ পরবর্তী সময় থেকে শুরু করে প্রাক স্বাধীনতা পর্যন্ত মধ্যবর্তী পর্বের সাতজন নির্বাচিত ঔপন্যাসিকের উপন্যাসসমূহ উক্ত গবেষণার মূল আলোচনায় বিশ্লেষিত হয়েছে

গবেষণা শিরোনামের শ্রেণী-চেতনা কথাটি দিয়ে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা, এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থানগত সচেতনতা এবং সেইসাথে এ বিষয়ে সজাগ হওয়াকে মূলত বুঝায়। 'শ্রেণী-চেতনা' বিষয়টি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। এটি স্বভাবতই শ্রেণীহীন সমাজগঠনে সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে সমর্থন করে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর থেকেই সারা পৃথিবীব্যাপী দ্রুতগতিতে সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে। মার্কসীয় চিন্তাধারা ও রুশ বিপ্লবের প্রেরণা তৎকালীন তরুণদের একাংশের মনেও সঞ্চারিত হয়। ১৯২৭-২৮ সনে গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। তখন থেকে দেশের উৎসাহী ও ন্যায়কামী লেখকরা রুশ বিপ্লবের আদর্শ ও বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নবনির্মাণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। এ অবস্থায় বাংলা সাহিত্যের একটি নবচেতনার ও নতুন ধারার সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের রচনার মধ্য দিয়ে মার্কসীয় এই নতুন ধারাটি বিকশিত হয়। ঢাকাতেও এর ঢেউ এসে লাগে। এ সময় ঢাকায় মার্কসবাদী সাহিত্য সংগঠন 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ' (১৯৩৯)-এর কার্যক্রম সাহিত্য শিল্পীর জীবনচৈতন্য ও শিল্পদর্শনকে অনেকাংশে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়। ফলে সৃষ্টিশীল রচনায় মার্কসবাদের সাম্যবাদী চিন্তার ভাল প্রভাব লক্ষ করা যায়। গণমুখিতার ছোঁয়া এসে লাগে সাহিত্যে। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের ছবি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ধারণা সাহিত্যে স্থান পায়। উক্ত মার্কসীয় সাম্যবাদী চেতনার ধারাবাহিকতা বিভাগপরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের উপন্যাসেও লক্ষ করা যায়। ফলে শ্রেণীশোষণ, শ্রেণীসংগ্রাম ও তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস প্রাসঙ্গিকভাবে এ সময়কালের উপন্যাসে আমরা রূপায়িত হতে দেখি। এক্ষেত্রে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি, সামাজিক শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনার-বাস্তবতা তুলে ধরার সাথে সাথে ব্যক্তি বা সমষ্টির কিছু কিছু বিদ্রোহের চিত্রও ঔপন্যাসিকরা তাঁদের উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সেইসাথে সমাজজীবনের মৌল শ্রেণীগত দ্বন্দ্বে বিভিন্ন শ্রেণী অস্তিত্বের বস্তুগত ও চেতনাগত পার্থক্য এবং শ্রেণীগত জীবন অন্বেষা, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব সংঘাত, তার ঐতিহ্যবোধ ও ইতিহাস চেতনা, স্বদেশ চেতনা কিভাবে সমগ্র জনসাধারণ ও নিজেদের মুক্তিপথ নির্দেশনায় ভূমিকা রাখে তার পরিচয়ও তাদের উপন্যাসে পাওয়া যায়।

বলা যায়, আমাদের দেশের ঔপন্যাসিকরা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দেশের জীবনধারায় বিরাজমান শ্রেণীগত বৈষম্য সম্পর্কে প্রত্যেকেই কমবেশি সচেতন ছিলেন। এ দেশে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সমাজের যে নতুন শ্রেণীবিন্যাস সূচিত হয়, তাতে অতীতের বিরাজমান শ্রেণীগুলো ভেঙে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। উক্ত শ্রেণী কাঠামোর ক্রম রূপান্তরই বিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশে লক্ষ করা যায়। আমাদের দেশের সমাজজীবনে প্রচলিত উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ, সংঘাত ও শ্রেণীসংগ্রাম রূপায়ণে ১৯৪৭-১৯৭১ সময় কালের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিকর্মে শ্রেণী-চেতনা বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে যে সাতজন ঔপন্যাসিক আমার গবেষণাকর্মের আলোচনায় স্থান পেয়েছেন তাঁরা হলেন, সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সরদার জয়েন উদ্‌দীন (১৯২৩-১৯৮৬), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৮), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), এবং আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)। উক্ত সাতজন ঔপন্যাসিকের ক্রমনির্ধারণ করা হয়েছে তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে।

আলোচনার সুবিধার্থে আমার গবেষণার পুরো বিষয়টি নিম্নরূপ অধ্যায়ে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করেছি:

প্রথম অধ্যায় : ১৯৪৭-১৯৭১ কালসীমায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিচয়।
দ্বিতীয় অধ্যায় : শ্রেণী ও শ্রেণী-চেতনা।
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার পটভূমি।
চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের সাধারণ পরিচিতি।
পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ।
উপসংহার অংশে গবেষণাকর্মের লক্ষ্য ও মূল্যায়ন বিধৃত করা হয়েছে।

সাহিত্য সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমার গবেষণাকর্মের মূল বিষয়ের ধারণাটাই যেহেতু ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত দেয়, সেহেতু আলোচ্য গবেষণা শিরোনামের স্বরূপ বিশ্লেষণে মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক প্রয়োগও অনেকে ক্ষেত্রেই রয়েছে।

এবারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পালা। প্রথমেই আমি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি। তিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনে সম্মত হওয়ায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া তাঁর অশেষ অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতা, প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সহায়তা ও বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা লাভ করে আমি গবেষণাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছি। এজন্য তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। সেইসাথে আমার এম.ফিল প্রথম পর্বের কোর্স শিক্ষক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান ও অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের কাছে গবেষণা বিষয়ে অনুপ্রেরণা ও গ্রন্থ সহায়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমি শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হকের কাছে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ এবং উৎসাহের জন্য বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণা নির্বাহকালে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আসমা জাহান
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
রেজিঃ নং-১/৯৭-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ-কথা		০৩
প্রথম অধ্যায়	বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি	০৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	শ্রেণী ও শ্রেণী-চেতনা	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার পটভূমি	২৯
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস	৩৯
পঞ্চম অধ্যায়	বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ	৪৪
উপসংহার		৮৮
গ্রন্থপঞ্জি		৯১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমি

উপন্যাস জীবনের সমগ্রতাস্পর্শী শিল্পরূপ। উপন্যাসে বিন্যস্ত জীবন নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে বহমান। বাঙালির সৃষ্টিশীল চেতনায় সমাজজীবনের দ্বন্দ্ব জটিল বিকাশ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেকারণেই 'বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিচয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত কলকাতা এবং মধ্যযুগের মোঘল- শাসকবর্গ প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে জন্মলগ্ন থেকেই স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ লাভ করে। মোঘল সাম্রাজ্য শক্তি তাদের শাসনব্যবস্থার অনুকূলে বাংলার কৃষিভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ কাঠামোকে সামন্ত সমাজে রূপান্তরিত করে। মোঘল আমলে সৃষ্ট বঙ্গীয় সামন্ত সমাজের বিরোধী কম্প্রেডর বা মুৎসুদ্দী[১] বাণিজ্য পুঁজিপতিদের সহায়তায় ব্রিটিশ বাণিজ্য পুঁজিপতিশক্তি ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে অধিকার করে নেয় বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা। ফলে সুলতানি আমলের 'বাঙ্গালা', আকবরের 'সুবা বাংলা' ব্রিটিশের উপনিবেশে পরিণত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত বাংলার রাজধানী ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর) এর পরিবর্তে কলকাতায় স্থাপিত হয় ভারতের প্রথম রাজধানী। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বাণিজ্য পুঁজি (Mercantile Capitalism) এবং শিল্প পুঁজিকেন্দ্রিক (Industrial Capitalism) শাসন প্রক্রিয়া এবং নব্যসৃষ্ট কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী সমাজগঠন ও জীবন বিন্যাসের বস্তুগত ও ভাবগত রূপান্তরকে অনিবার্য করে তোলে।"[২]

এর ফলে ব্রিটিশ পুঁজির সহযোগী হয়ে গড়ে উঠতে থাকে ভারতীয় পুঁজি এবং উভয় পুঁজির পক্ষপুটে লালিত, বর্ধিত হয়ে গড়ে ওঠে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বঙ্গীয় পুঁজি ও তার সহযোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসজাগরণই বাঙালির পুনর্জাগরণ নামে পরিচিত। হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি চেতনায় পরিপুষ্ট এক শিক্ষিত জনশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ১৮৫৮ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই নবোদ্ভূত শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় উচ্চশিক্ষার দ্বার। এই নবোলব্ধ শিক্ষা সংস্কৃতির ভাবধারার ইতিবাচক আলোড়নের ফলে বাংলার সমাজজীবন থেকে রামমোহন রায় (১৭৭২- ১৮৩৩), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮- ১৮৯৫) প্রমুখের মত প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের জন্ম সম্ভব হয়। অপরপক্ষে ১৭৫৭-এর পরবর্তী সময়প্রবাহে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হৃতগৌরব ঢাকা শহর তথা পূর্ববাংলার জীবনকাঠামো ও সমাজবিন্যাসের রূপান্তর প্রক্রিয়া থাকে মন্থর ও পশ্চাৎপদ।

দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ বাঙালি মনীষীর যে বিচিত্রমুখী বিকাশ সাহিত্য-শিল্প-দর্শন ও বিজ্ঞান চিন্তার মধ্য দিয়ে ক্রমপরিণতি লাভ করেছিল, বলতে গেলে, তার সম্পূর্ন কৃতিত্বই বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-সাম্রাজ্যবাদী শাসনামলে যে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, ক্রমানুয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের নেতৃত্ব, শিক্ষা সরকারি চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই জনস্রোতের একাংশ পরিণত হয় বণিক শ্রেণীতে। অন্যদিকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে সংঘটিত সিরাজ-উদ্-দৌলার পতন বাঙালি মুসলমানের কাছে নিজেদের দুর্ভাগ্যের সমান্তরাল অনুভূতিতে পর্যবসিত হয় । বর্তমান বিমুখতা, অতীত প্রীতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-দর্শন ও বিজ্ঞানকে বাঙালি হিন্দু যেখানে জাগতিক অগ্রগতি ও বৈষয়িক মুক্তির অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে, সেখানে এক ধরনের অহংবোধ, অভিমান ও ইংরেজের প্রতি অসহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান তা থেকে বিরত থাকে। এর ফলে, কেবল তাদের বৈষয়িক অগ্রগতিই ব্যাহত হয় না, ভাব জগতেও আসে দীনতা, পশ্চাদমুখিতা। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ও তার পরিণতি মুসলমান জনশ্রেণীর মধ্যে কিছুটা আত্মসমীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন চেতনার অঙ্গীকারে মুসলমান জনশ্রেণীর মধ্য থেকে যে নতুন মধ্যবিত্তের জন্ম সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাকে একটি শ্রেণী চরিত্রে পরিণত হতে অপেক্ষা করতে হয় বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন পর্যন্ত। বাংলাদেশের এই নবোদ্ভূত মধবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ তরান্বিত হয় তিনের দশকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯২১) মধ্য দিয়ে।

তবে অবিভক্ত বাংলার বিভাগপূর্ব আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, দ্রুত নগরায়ণ, মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের অভিঘাতে কলকাতা নগর ও পার্শ্ববর্তী সমাজ সংগঠন ও জনজীবনে যে গতি, সংঘর্ষ ও বৈচিত্র্যকে অনিবার্য করে তোলে; তা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈষম্যনীতির কারণেই ঢাকা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী সমাজ কাঠামো ও জীবন বিন্যাসে সে রূপ বিবর্তন বিলম্বিত হয় বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক পর্যন্ত। ইংরেজ শাসকদের শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টিকে অনিবার্য করে তোলে তার সমগ্র ঔজ্জ্বল্য, সুকৃতি-বিকৃতি কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ১৮৫৭ খ্রি: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘটনা থেকে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশগত তারতম্যের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে, চিন্তায়-মূল্যবোধে-জীবনবিন্যাসে এবং

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ গঠনের স্বাতন্ত্র্যে বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিকাশকে দুই পৃথক ধারায় প্রবাহিত হতে বাধ্য করে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, মুসলমান তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল দূরসঞ্চারী, ইতিবাচক প্রাণচাঞ্চল্যে গতিময়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিত্র্য ছিল সাম্প্রদায়িকতা বর্জিত এবং যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনাস্পর্শী। দেশ বিভাগের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিলো ইংরেজের শাসন-তোষণ-নীতির গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিসমূহের মধ্য থেকে- যাঁদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালকাটা মাদ্রাসা কিংবা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ববাংলার মুসলমান তারুণ্য আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে যেমন মুক্তিলাভের সুযোগ পায়, তেমনি, প্রথাগত সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার হবার শক্তি অর্জন করে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ অঞ্চলের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং মুসলমান সমাজে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবও অনিবার্য হয়ে উঠে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ-স্কুল উত্তীর্ণ নব্যশিক্ষিতের সমবায়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছিল ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা, যুক্তিবাদ-মানবতাবাদকে অঙ্গীকারকল্পে ১৯২৬ খ্রি:-এ প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং প্রকাশ করেন উক্ত সংগঠনটির মুখপত্র 'শিখা' । এ সাহিত্য সমাজের আদর্শ ছিলো চিন্তাচর্চা, জ্ঞানের সমন্বয় সাধন ও সংযোগ সাধন। 'শিখা'র ভূমিকাংশে ছাপানো হতো "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" --- শিখা সম্প্রদায়ের ভাববিপ্লবের সংঘাত-তরঙ্গে-পূর্ববঙ্গীয় মধ্যবিত্তের গণজাগরণের প্রবাহ হয়েছিল গতিবান। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে। মুসলমান সমাজের বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তিদানের বাসনা এ সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে করেছিল বিশিষ্ট। সমকালীন শিক্ষিত তরুণ-মানসে এর আবেদন ছিল বিস্ময়কর। দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তার চাইতেও গুরুতর যোগ এর ছিল বাংলার বা ভারতের এ-কালের জাগরণের সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলেই গড়ে উঠেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের গতিনির্দেশক পটভূমি। এ-প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ্যযোগ্য: "কল্লোলের বীজ বপন হইয়াছিল ঢাকায়-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের বার্ষিক পত্রিকা বাসন্তিকায় (১৯২২)।.... কল্লোলের প্রবাহ কিছু দূর গড়াইলে পরে ইহার একটি কচি শাখা বাহির হইয়াছিল ঢাকায়-প্রগতি (১৯২৭)।"[৩]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিভেদের জটিল রাজনৈতিক প্রবাহের সমান্তরালে এ-সময়ে আরেকটি রাজনৈতিক ধারা সক্রিয় রূপ নেয়। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের তত্ত্বাবেগ কমরেড মুজাফফর

আহমদের কর্মপ্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক পর্যায়ে উপনীত হয়। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২৭-২৮) গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সর্বাগ্রগণ্য। কৃষিভিত্তিক শোষণমূলক সমাজের তরুণমানসে প্রগতিশীল আন্দোলনের আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে। বাঙালি মুসলমানের সচেতন অংশের নেতৃত্বে প্রজা পার্টি (১৯১৪) গঠন এবং কমরেড মুজাফফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদনায় নবযুগ (১৯২১) পত্রিকার প্রকাশনা এই প্রগতিশীল ও মুক্তিকামূলস্পর্শী রাজনীতিচেতনার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। ত্রিশের দশকে জাতীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় ধর্মকেন্দ্রিক সামন্তবাদী, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ-সৃষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এ-সময়ে মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী কিছু সংখ্যক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠা করেন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'(১৯৩৯)। চল্লিশের দশকে এই সংগঠনের কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরে বিস্তার লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রতিক্রিয়ায় যে নব্যশিক্ষিত, প্রগতিশীল ও বুর্জোয়া মানবতাবাদে আস্থাশীল মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়, তা সংঘবদ্ধ শ্রেণীচরিত্রে রূপ নেওয়ার পূর্বেই কার্যকর হয় ভারত বিভাগ (১৯৪৭)। নয়া-উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী আদর্শবাহী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রই যে দেশবিভাগের নেপথ্যে বিদ্যমান ছিলো, তা এখন স্বীকৃত সত্যে পর্যবসিত। অসমবিকশিত সমাজের শ্রেণী-অস্তিত্বের অসংগঠিত অবস্থা এবং দ্বন্দ্বজটিল ও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতাপুঞ্জ পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্রতায় যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল; তেমনি, স্বাধীনতার আকর্ষণেও অভিভূত হয়েছিল।

উল্লিখিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপট নিরিখে বলতে পারি, জাতীয় ইতিহাসের যে বৈপ্লবিক ধারা দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং রক্তাক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন, শোষণমুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রস্তুত করেছিল। ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগ ও তার অব্যবহিত ঘটনাপ্রবাহ সেই ধারাকে করে তোলে অবরুদ্ধ, দ্বন্দ্বরক্তিম ও দ্বিধাযুক্ত। প্রায় দু'শ বছরের শাসনামলে ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের বৈষম্যমূলক শোষণের প্রয়োজনে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ বপন করেছিল, ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ ছিল সেই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রেরই বিষময় ফল। মূলত "সেই মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা ছিল খণ্ডিত, অশ্রুসিক্ত ও শোণিতলিপ্ত। সে স্বাধীনতা ছিল একই সঙ্গে আমাদের Triumph ও Tragedy"[৪], সেই শোণিতলিপ্ত ঘটনা পরম্পরার সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্তক পর্যায়ে ছিল, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি। আর্থ-উৎপাদন কাঠামো এবং ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের পূর্বাঞ্চল ও তার জনগোষ্ঠীর জন্য এ রাজনৈতিক মীমাংসা হল অসঙ্গত ও একেবারে ঐতিহাসিক ধারার পরিপন্থী। ফলে দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

নতুন রাষ্ট্রীয় পরিচয় পেল বটে; কিন্তু আরেক নতুন উপনিবেশের কবলে গিয়ে পড়লো। এক সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে থাকে। পূর্ববঙ্গের মানুষের দুর্দশা ক্রমাগত বেড়ে চলে; অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের কৃষকদের শ্রম নিংড়ানো অর্থের বিনিময়ে মজবুত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, কল-কারখানা সবকিছু গড়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ববঙ্গ সর্বক্ষেত্রেই থেকে যায় বঞ্চিত-অবহেলিত। বস্তুত রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক-শ্রেণীর হাতে থাকায় অর্থনৈতিক শোষণও তারা চালাতে থাকে অবাধে। সমাজবিজ্ঞানী অনুপম সেন তাঁর 'বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ' গ্রন্থে দেখান, পঞ্চাশের দশকে কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র পূর্ববঙ্গ পাট-উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্ববাজার থেকে যে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, তার প্রায় সম্পূর্ণটাই আত্মসাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানের বণিক শ্রেণী। তিনি লিখেছেন- "এভাবে পূর্ববঙ্গের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে সঞ্চিত হয়। এবং তা বিনিয়োগ করেই পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের সূচনা হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের এ শিল্পোন্নয়নে পূর্ববঙ্গের কোনো লাভ-ই হয়নি। --- অধিকন্তু পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা হয়। পূর্ববঙ্গের গরিব জনসাধারণ বাধ্য হয় বিশ্বের খোলা বাজারে যে জিনিসের দাম এক টাকা, সেটা দু'টাকা অথবা তিন টাকায় এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচ টাকায় কিনতে। এভাবে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা হয়।"[৫] উক্ত উদ্ধৃতিতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১, এ পুরো সময়ের একটা সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন পাওয়া যায়। ব্রিটিশ উপনিবেশের হাত থেকে পূর্ববঙ্গ চলে যায় পাকিস্তানি উপনিবেশের অধীনে। এ-অবস্থা শোচনীয়তর হয় ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনের ফলে। সামরিক শাসনে ব্যক্তির বাক-স্বাধীনতা ও অন্যতর অধিকারসমূহ থেকে সে বঞ্চিত হয়। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের কৃষকের অবস্থা হতে থাকে সবচাইতে খারাপ। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োজিত থেকে পূর্ববঙ্গের কৃষক রাষ্ট্রের যোগান নিশ্চিত করে যায়, তা ছিল দুর্দশাগ্রস্ত, প্রাক-পুঁজিবাদী ধরনের; এবং এরকম পশ্চাৎপদ অবস্থায় কৃষকের উৎপাদন-ক্ষমতাও হয় ক্রমক্ষীয়মান। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গে শিল্পায়ন গড়ে উঠেনি, সেহেতু কৃষির ওপর চাপ ক্রমশ বেড়েছে। শিল্পবিকাশহীন সমাজে উপরন্তু ছিল বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহের দায়। এভাবেই নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে দারিদ্র্যের উত্তরোত্তর আগ্রাসন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনের এই গুণগত পরিবর্তনহীনতা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাৎপদতার ফলে দেখা গেল বৃহত্তর জনজীবনে পাকিস্তানি প্রশাসন তার জন্মলগ্নেই মোহভঙ্গের কারণ হয়ে উঠলো। ধর্মাদর্শনির্ভর রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার নামে পাকিস্তানি শাসকবর্গ বাংলাদেশে জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ ও সাংস্কৃতিক অবরোধ সৃষ্টিতে হলো তৎপর। এর বিরুদ্ধে বিশ শতকের ক্রমবর্ধমান বাঙালি বেনিয়া পুঁজিবাদী এবং স্ফীতকায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী ও মার্কসবাদী

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিবাদ করে ১৯৪৮-এ। বৃহত্তর জনজীবন-বিচ্ছিন্ন ঢাকায় নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই প্রতিবাদ ততোটা তীব্র না হলেও এর মধ্যে থেকেই অঙ্কুরিত হলো গণজাগরণ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বীজ।

বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করায় পাকিস্তানি শাসকবর্গের অব্যাহত চক্রান্তের প্রতিবাদে এ-দেশের সচেতন ছাত্রসমাজ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলে। গঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ (৩০ জানুয়ারি, ১৯৫২)। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২-এ রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী এক সাধারণ ধর্মঘটের আহবান জানানো হয়। গণশক্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে স্লোগানের বিক্ষুব্ধ মিছিল নিয়ে অগ্রসর হতে থাকলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পুলিশ ছাত্র মিছিলে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই শহীদ হন আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ। গুরুতর আহত হন সতের জন। হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁদেরকে। তাঁদের মধ্যে আবুল বরকত মৃত্যুবরণ করেন রাত আটটায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রচণ্ড দমন, নির্যাতন ও গ্রেফতার সত্ত্বেও ২১ ফেব্রুয়ারি, রক্তদানের প্রতিক্রিয়ায় বৃহত্তর জনজীবনে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তীব্ররূপ ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, মুষ্টিমেয় ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন ছিল না, তা শুধু শিক্ষাগত অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনও ছিল না। বস্তুতপক্ষে তা ছিল পূর্ব বাংলার ওপর সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার পাকিস্তানি শাসক-শোষক শ্রেণীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক বিরাট ও ব্যাপক গণআন্দোলন।

ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মানবতাবাদী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি রূপে সমাজজীবনের বৃহত্তর পরিসরে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। পাকিস্তানি মুৎসুদ্দী পুঁজি ও সামন্তশক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রত্যাশী পুঁজির সংঘাত হয়ে ওঠে তীব্রতর। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানি বেনিয়া পুঁজি ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তশক্তির ধারক মুসলিম লীগের সর্ববিধ প্রয়াস সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভে সমর্থ হয়। ৫৪'র নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়েই প্রথম সূচিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের গণতান্ত্রিক বিজয়।

১৯৫২ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর সাধিত হয়। বাঙালি বেনিয়া পুঁজি, পাকিস্তানি পুঁজির সহযোগী হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। সাধারণ নির্বাচনের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমদানি বাণিজ্যে পূর্বাঞ্চলের নবাগতদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা বন্টন ব্যাপারেও দুই প্রদেশের মধ্যে সমতারক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবেই প্রস্তুত হয় বাঙালি জাতীয় পুঁজি বিকাশের পটভূমি।

সংগ্রাম, রক্তপাত ও উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে বাঙালি জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরেই ইতিবাচক রূপান্তরের সূত্রপাত হয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ও প্রগতিশীল চেতনায় সমৃদ্ধি অর্জন করে। পাকিস্তানি পুঁজিবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা হয় ক্ষণস্থায়ী। ১৯৫৪ সালের মে মাসে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। এটা ছিল বাংলাদেশের সামন্তপ্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর পুঁজিবাদীদের প্রথম আঘাত; কিন্তু মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেও ১৯৫৯-এর পূর্বে পুঁজিবাদ জয়যুক্ত হতে পারেনি। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ছিল সামন্ত প্রথাভিত্তিক গণতন্ত্রের উপর শেষ ও চরম আঘাত। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর ১৯৫৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বারবার মন্ত্রিসভার পতন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করে দেয়।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তন (৭ অক্টোবর, ১৯৫৮) পাকিস্তানি নয়া উপনিবেশবাদী শাসননীতির অন্তর্ঘাতক চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সংগ্রামশীল অগ্রযাত্রার পটভূমিতে পাকিস্তানি সামরিকতন্ত্র উদ্ভুত মৌলিক গণতন্ত্রের শৃঙ্খল জাতিকে গভীর সংকটে নিক্ষেপ করে। যে সমস্ত মূল্যবোধ, ধর্মমোহ ও সাম্প্রদায়িক চেতনা এক দশকের অভিজ্ঞতা (১৯৫২-১৯৫৮) ও সংগ্রামে জাতিসত্তার কাছে পরিবর্জিত প্রায় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, আইয়ুবী দশকের সূচনায় তাকেই ব্যবহার করা হয় নব আঙ্গিকে। ফলস্বরূপ দেখা যায়, সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা চলে। তারই কৌশল রূপে সংগ্রামী নেতৃবর্গকে করা হয় কারারুদ্ধ। জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের গতিও এর ফলে বাধাগ্রস্ত হয়। দেখা গেল, পাঞ্জাবি বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তি তাদের শাসন এবং শোষণকে দৃঢ়মূল করার লক্ষ্যে কেবল রাজনীতি ক্ষেত্রেই নানামুখী পদক্ষেপ নিল না, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তারা সুদূরপ্রসারী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বি.এন.আর., প্রেস ট্রাস্ট, পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড (পূর্বাঞ্চল শাখা) ইত্যাদি সংস্থা যেমন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তেমনি আদমজী, দাউদ ও অন্যান্য পুরস্কার প্রবর্তন এবং উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে সচেতন-বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের শৃঙ্খলিত ও চেতনাদাসে পরিণত করার প্রচেষ্টায় পাকিস্তানি সামরিক সরকার অনেকাংশে সাফল্যও অর্জন করে। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে উদ্ভুত অধিকাংশ ঔপন্যাসিকই জীবনবোধের ক্ষেত্রে পূর্বপ্রতিশ্রুতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। এ সময় মার্কসবাদী সাহিত্যিকদেরও পরিবর্তন ঘটে। তাঁরা জীবিকার উন্নতি ও নিরাপত্তার সঙ্গে সৎভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যভাবনা এবং শিল্পশরীরের রূপান্তর করলেন। কেউ হলেন ফ্রয়েডে আশ্রয়ী , কেউ-বা স্বল্পভাষী, কেউ-বা আত্মগোপন করলেন রোমান্টিক স্বপ্নলোকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। সে কারণে, শাসকবর্গের প্রতিরোধ সত্ত্বেও এ-পর্যায়ের উপন্যাসে রোমান্টিকতা, সংক্ষোভ, প্রতিবাদ, ইতিহাস-অন্বেষা, আত্ম-আবিষ্কারের প্রচেষ্টা প্রভৃতি যেমন বিদ্যমান, তেমনি স্বপ্নময় জীবনকল্পনা এবং ভাবলোক-বস্তুলোকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-উদ্ভূত স্ববিরোধ থেকে আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পলায়নবৃত্ত রচনার প্রবণতাও হল সুস্পষ্ট। বায়ান্নর রক্তাক্ত উজ্জীবন যে-সব ঔপন্যাসিকের চেতনার সংরক্ত আবেদন নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলো, আয়ুবী দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে তাঁদের অধিকাংশের মধ্যেই সৃষ্টি হয় আত্মমুখী প্রবাহস্রোত।

১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলন, পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬৫), ছয়দফা কর্মসূচি, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনা জাতীয় জীবনে নবউদ্দীপনা সঞ্চারে সক্ষম হয়। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন অংশত ও সাময়িক সাফল্য অর্জন করলেও স্বাধিকারকামী বাঙালি তারুণ্য গোড়া থেকেই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে । ছাত্রসমাজের অগ্রগামী ভূমিকা প্রতিটি আন্দোলনকেই ইতিবাচক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে। অপরপক্ষে, ১৯৪৮ ও ১৯৫২-র প্রতিবাদী মধ্যবিত্ত এ-পর্যায়ে অনেক বেশি সচেতন ও সংঘবদ্ধ ছিল। পাকিস্তানি জাতিশোষণ ও শ্রেণীশোষণের স্বরূপ তাদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট ছিল। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাংলা পশ্চাৎপদ হলেও শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুণে। বাঙালি স্বাধীন পুঁজি বিকাশের ধারণাটিও এ পর্যায়ে একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। পাঞ্জাবি বেনিয়া পুঁজিবাদী শক্তির সঙ্গে নবোদ্ভূত বাঙালি পুঁজির দ্বন্দ্ব ১৯৫৪ সালে প্রথম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পেলেও, শ্রেণীগত দিক থেকে অশক্ত ও রাজনৈতিকভাবে অসংবদ্ধ থাকার ফলে তার সাফল্য হয় বাধাগ্রস্ত। ছয়দফা কর্মসূচি জাতির স্বাধিকারের ব্যাপারটিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ করে, তেমনি, বাঙালির স্বাধীন বিকাশের স্বরূপ প্রসঙ্গেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান পাকিস্তানের শাসনযন্ত্রের ভিত্তিকে যেমন দুর্বল করে দেয়, তেমনি প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন স্বাধীনতার ধারণাকে বস্তুনিষ্ঠ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর্যায়ে নিয়ে আসে। ছাত্রসমাজের ১১-দফা আন্দোলন বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামে সঞ্চার করে গতিশীল প্রাণাবেগ। ১৯৭০-এর গণতান্ত্রিক সাফল্য একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অভ্যুদয়কে অনিবার্য লক্ষ্যের দিকে চালিত করে।

১৯৫৮-৬৮ কালপর্বে সামরিক একনায়কতন্ত্রের ভয়াল নখর আসলে শিল্পীর স্বাধীনতার জন্য যে পূর্বশর্ত, সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সর্বাংশে ধ্বংস করতে চেয়েছিল দমন, পীড়ন ও অত্যাচারের মাধ্যমে। ১৯৬৯-এ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেই আগ্রাসী একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিই

Dhaka University Institutional Repository

কেবল বিপর্যস্ত হলো না, নব্য-উপনিবেশবাদের জাতিক-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছিল জাতীয় চৈতন্যে। উপনিবেশ, সামরিক শাসন ও গণতন্ত্র যে একসঙ্গে চলতে পারে না, সত্তরের গণতান্ত্রিক বিজয় ও একাত্তর সালে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনে অপরিমেয় ত্যাগ, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও সাফল্যের সূর্যোদয়ে গৌরবময়। ইতিহাসের যে দ্বন্দ্বময় ও গতিশীল ধারা পলাশীর বিপর্যয় (১৭৫৭), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), কংগ্রেস-মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিভেদের রাজনীতি, পাকিস্তান আন্দোলন, ১৯৪৭-এর অসঙ্গত রাজনৈতিক মীমাংসা, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সেই ঐতিহাসিক নিয়মেরই চরম পরীক্ষা। জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের প্রশ্নে জনগোষ্ঠী এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল এই যুদ্ধে। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে করতলগত করে। সুদীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও নিপীড়নের ফলে জাতির সৃষ্টিশীল চেতনায় যে ক্ষোভ, প্রতিবাদ, সংগ্রামশীল জীবনদৃষ্টি এবং ভবিষ্যতস্পর্শী কল্পনার জন্ম হয়েছিল, যুদ্ধের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও সাফল্যে তার গঠনমূলক রূপান্তরের পথ সুপ্রশস্ত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে রক্তাক্ত যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের গতি অল্প কিছুকালের মধ্যেই হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য ছাড়া বাংলাদেশের সমাজ-কাঠামোতে তেমন কোন গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা জাতির চিন্তা-চেতনায়, মন ও মননে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের প্রত্যাশার দিগন্তকে করেছিল সুবিস্তৃত। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরের মধ্যেই জাতীয় চৈতন্যে পরাজয় ক্লিষ্টতা প্রকাশ পেতে থাকে। মূল্যবোধের স্তম্ভগুলো যেন খসে পড়তে থাকে। গণতন্ত্র হয়ে ওঠে সমরাস্ত্র শাসিত; জাতিশোষণ রূপান্তরিত হয় শ্রেণীশোষণে। সহস্র কোটিপতির রসদ সরবরাহে আমাদের অস্তিত্বমূল শুকিয়ে যায়। রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয় ছিন্নমূল সব ভাড়াটে কুশীলবের দল। তাদের ছদ্মবেশের আড়ালে দেখা যায় অতীত কংকাল। জাতীয় অস্তিত্বের এই বিবর্ণ পটভূমিতে, ঔপন্যাসিকের চেতনালোক হয়ে পড়ে রক্তাক্ত। এই রক্ত রঞ্জিত, হতাশায় ব্যর্থতায় ক্ষতবিক্ষত এবং সংগ্রামশীল জীবনদৃষ্টিতে প্রত্যাবর্তন ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত ও '৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাসে লক্ষ করা যায়।

বস্তুত বিভাগোত্তর বাংলাদেশ ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হবার ফলে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতাকামী চৈতন্য নিক্ষিপ্ত হয় এক অন্ধকার সমাজ গহ্বরে, যেখানে ধর্মাদর্শের প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলিত করা হয় পাকিস্তানের নয়া ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোতে। সাম্রাজ্যবাদী

শাসন-শোষণ রূপান্তরিত হয় জাতিশোষণ ও শ্রেণীশোষণের জটিল প্রক্রিয়ায়। জাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ে নতুন ব্যাখ্যাদানেরও চেষ্টা হয়। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশসূত্রে যে গুণগত পরিবর্তন প্রত্যাশিত ছিল, বাঙালি জীবনে তার প্রতিষ্ঠা হয় বাধাগ্রস্ত। দাঙ্গা, মহামারী, দারিদ্র্য, উদ্বাস্তু সমস্যা, নিপীড়ন, সংস্কৃতি বিলোপের চেষ্টা প্রভৃতি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে নিক্ষেপ করে গভীর সংকটাবর্তে। উক্ত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় রাষ্ট্র ও সমাজ বিন্যাসের নতুন রূপ এবং অস্তিত্বের নবতর জিজ্ঞাসায় বিভাগোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় উৎস এক স্বতন্ত্রমাত্রা লাভ করে। তাই বিভাগোত্তর উপন্যাস থেকে আমরা বাংলাদেশের সমাজ-মানস ও ব্যক্তিমানসের বৈচিত্র্য ও গভীরতাকে স্পর্শ করতে পারি। যেখানে জাতিশোষণের তীব্র সংঘাত ও সংগ্রামের পাশাপাশি শ্রেণীশোষণের পরিচয় তীব্র হয়ে উঠেছে। ফলে সমাজ ও জীবনের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসের উপকরণ ও বিষয় চেতনায় তার স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. কম্প্রেডর বা মুৎসুদ্দী: যারা আত্মস্বার্থ হাসিলের জন্য স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বৈদেশিক শক্তির কিংবা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করে তাদেরকে আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় ইংরেজিতে বলা হয় কম্প্রেডর।

২. রফিক উল্লাহ খান, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, পৃ: ৪৩-৪৪।

৩. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৬), পৃ: ২৫৯।

৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, 'স্বাধীন ভারত সমস্যা, সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্ভাবনা' দেশ, সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত (৫৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, কলকাতা, ১০ আগস্ট, ১৯৯১) পৃ: ১৯।

৫. অনুপম সেন, বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ, পৃ: ১১-১২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণী ও শ্রেণী-চেতনা

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী ও শ্রেণী-চেতনা

আধুনিক যুগের বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে এ কালের বাঙালি সমাজের সামাজিক শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক বিরোধ ও সংগ্রামের চিত্র। আমার গবেষণা শিরোনামের শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ বিষয়টি শ্রেণী বিভক্ত সমাজের দ্বান্দ্বিক পরিচয়কে নির্দেশ করে। শ্রেণী-চেতনা ধারণাটি তাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ধনিক ও শ্রমজীবী শ্রেণী, শোষক ও শাসিতের দ্বান্দ্বিক অবস্থানের সূত্র ধরেই শ্রেণী-চেতনা ধারণাটির উত্থান। তবে আলোচনার সুবিধার্থে শ্রেণী-চেতনা প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের পূর্বে প্রথমেই জেনে নেয়া দরকার 'শ্রেণী'র স্বরূপ ও এর তাত্ত্বিক ধারণা।
'শ্রেণী' কাথাটি unity বা একক নির্দেশক একটি শব্দ। পৃথিবীর সব সমাজেই শ্রেণী বা স্তর বিন্যাস রয়েছে। সমাজে 'শ্রেণী' বলতে বুঝায় একই মূল্যবোধ ও অবস্থানের উপর নির্ভরশীল একটি জনগোষ্ঠী যা অন্যান্য জনগোষ্ঠী হতে আলাদা।

প্রাচীন ও আধুনিককালে সামাজিক শ্রেণীসমূহ প্রধানত দু'টি ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে-- ভূমি ও পুঁজি। প্রাক-ধনতান্ত্রিক যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রধান সম্পদ ছিল ভূমি। ভূমি ছাড়াও কোথাও-কোথাও গৃহপালিত জন্তু ক্রীতদাস এবং ভূমিদাস সম্পদের অন্যতম মুখ্য উৎস হিসেবে গণ্য হতো। যারা এ-সমস্ত সম্পদের মালিক হতো, তারাই উৎপাদনের উৎসকে নিয়ন্ত্রণ করতো। "এ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে রাষ্ট্রের তিনটি স্তর বিন্যাসের উল্লেখ করেছেন--সম্পদশালী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দরিদ্র। ইতিহাসে যা প্রাচীন সমাজ হিসেবে পরিচিত, অর্থাৎ প্রাচীন ইউরোপের দু'টি সমাজ ব্যবস্থা গ্রীক ও রোম, সেখানে আমরা দুটো মুখ্য শ্রেণী দেখতে পাই। একটি হলো দাস-মালিক শ্রেণী ও অপরটি দাস। প্রাচীন ভারত বা এশিয়ায় এ ধরণের শ্রেণী বিন্যাস ছিল না। এখানে যে বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য বা রাজ্য গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর ভিত্তি ছিল প্রধানত ভূমি কেন্দ্রিক গ্রাম-সমাজ। এসব অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম সমাজে আমরা স্বাধীন কৃষক, গ্রামীন প্রধান, গ্রামীন জমিদার এবং তার উপরি স্তরে ছোট খাট জমিদার বা রাজস্ব সংগ্রাহক, রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গ এবং ছোট ভূম্যধিকারী এবং রাজা-মহারাজা ইত্যাদি দেখি। আমাদের এশীয় সমাজে প্রধানতঃ ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে কৃষক ও কৃষিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরণের উৎপাদক ও কারিগর শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখতে পাই, যারা গ্রামীণ সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে বাস করতো। এসব কারিগরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়- কামার, কুমার, ছুতোর, নাপিত, গোয়ালা, তাঁতী, জেলে, স্বর্ণকার প্রভৃতি। এ-ছাড়াও চর্যাপদ, দোহাকোষ ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা অন্ত্যজ শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখি। সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আদিম সাম্য সমাজের পরে যখন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, তখন থেকেই মানব সমাজ শ্রেণীবদ্ধ। সামাজিক শ্রেণীকে কেন্দ্র করে সমাজ বিজ্ঞানীরা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব সমাজ বিজ্ঞানীর মধ্যে দু'জন তাত্ত্বিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁদের তত্ত্বই অধিকাংশ সামাজিক শ্রেণী বিশ্লেষনের ভিত্তি। এঁরা হলেন কার্ল মার্কস ও ম্যাকস ওয়েবার। কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব অনুযায়ী মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রধানতঃ শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস"[১]।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী জিন্সবার্গ-এর মতে, 'সামাজিক শ্রেণী হলো সমষ্টির একটি অংশ যারা পরস্পর সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষায়, বৃত্তিতে অন্যান্য গোষ্ঠী হতে আলাদা।' অর্থাৎ কোন জনসমষ্টির যে অংশ বৃত্তি, সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে পৃথকভাবে চিহ্নিত, সে অংশগুলোই সমাজের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসেবে পরিচিত।

নৃ-বিজ্ঞানী Nadel (নেডেল) সমাজের মানুষের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

'সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত শ্রেণী হল একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির বিভিন্ন সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি রূপ বিশেষ যা তাদের ভূমিকার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।'
সমাজবিজ্ঞানী 'মার্কস'-এর মতে, উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সমাজ কাঠামো। এই সমাজকাঠামোর মধ্য থেকে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন সামজিক শ্রেণীর।

ভ.ই. লেনিন শ্রেণীর সংজ্ঞায় বলেন,
"ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সামাজিক উৎপাদন প্রণালীতে তাদের অবস্থান দ্বারা, উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনে নির্ধারিত) দ্বারা এবং ফলত সামাজিক সম্পদে তাদের যে পরিমাণ অংশভাগ আছে তার বিলিবন্টন ও অর্জনের ধরণ দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক বৃহৎ জনবর্গ।"[২]

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে এমন কোন সমাজের অস্তিত্ব নেই যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য বা বৈষম্য নেই। সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত- কেউ আয়ের দিক থেকে, কেউ শিক্ষার দিক হতে, আবার কেউ কেউ ক্ষমতার দিক থেকে। অর্থের দিক হতে মানুষকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) ধনী, (২) মধ্যবিত্ত, (৩) দরিদ্র।

শিক্ষার দিক থেকে সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যেমন-শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। অশিক্ষিত আবার স্বাক্ষর ও নিরক্ষর এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণী বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে সামাজিক শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রাগত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

আবার ক্ষমতার ভিত্তিতে সমাজের মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন- (১) শাসক, (২) শাসিত। এভাবে সমাজের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন সমাজই পুরোপুরি সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।
সমাজতাত্ত্বিক Maciver & Page বলেন, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস বলতে (১) মর্যাদাভিত্তিক স্তরবিভাগ বোঝায় এবং (২) উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ নির্দেশ করে। তাঁদের মতে সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। কাজেই সামাজিক শ্রেণী বা স্তর বিন্যাসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের মূলে রয়েছে সমাজে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অসম অবস্থান। এই অবস্থানের এক প্রান্তে উচ্চশ্রেণী এবং অন্য প্রান্তে নিম্নশ্রেণী দেখা যায়। বাংলাদেশে এই সামাজিক বাস্তবতা প্রকট। এদেশে পাঁচতলার নিচে গাছতলায় মানুষের আশ্রয় গ্রহণের চিত্র উক্ত সামাজিক বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি।

পৃথিবীর সব সমাজেই শ্রেণী বিভাজন বিদ্যমান। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে, আদিম সমাজেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আদিম সমাজে গোত্র প্রধান বা দলপতি গোত্রের অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সেখানে স্ত্রী-পুরুষভেদে সামাজিক অসমতা দেখা দিত। আদিম সমজে অসমতা ছিল একথা অবশ্য মার্কস স্বীকার করেন না। তাঁর মতে আদিম সমাজ ছিল সাম্যবাদী সমাজ। আদিম সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না বলে সেখানে শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব হয় নি। কিন্তু যখন থেকে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা সৃষ্টি হয় তখন থেকেই শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মার্কসের মতে এটিই ছিল শ্রেণীবিন্যাসের অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের পটভূমি লক্ষ করলে দেখি, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে সমাজব্যবস্থা পুরোপুরি বন্দী ছিল সামন্ততন্ত্রের হাতের মুঠোয়, "ইংরেজ শাসন তার এই বন্দিদশা ঘুচিয়ে শহরকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। অর্থনৈতিক জীবনের মাপকাঠিও রূপান্তরিত হয় জমি থেকে মুদ্রায়। .. .. অর্থনৈতিক কাঠামোর এই মৌলিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস দেখা দেয়। যেমন- বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণী অন্যদিকে রায়েত শ্রেণী গড়ে উঠল। গ্রামাঞ্চলে এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দেখা দিল বড় ও ছোট জোতদার, ক্ষেতমজুর, ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রেণীর। শহর এলাকায় তেমনি সৃষ্টি হল পুঁজিপতি, শিল্পপতি, বণিক শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী। ছোট বড় ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ও সাংবাদিক প্রভৃতি বৃত্তিভোগী শ্রেণী। অর্থনৈতিক সংগঠনের মৌলিক রূপান্তর এবং নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই নতুন শ্রেণীবিন্যাস সাধনের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের বৈপ্লবিক ভূমিকা নিহিত।"[৩] এই সামাজিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বর্তমান শ্রেণী কাঠামোতে ভিন্নতর প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। গ্রামীণ সামাজিক বাস্তবতায় স্তর বিন্যাসে যেসব উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে জমিই প্রধান। ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ ও মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজে নিম্নলিখিত শ্রেণী দেখা যায়:

ভূমিহীন কৃষক : এক) যাদের বসতবাড়ি ও কৃষি জমি কিছুই নেই। দুই) যাদের বসতবাড়ি আছে কিন্তু কৃষিজমি নেই।

প্রান্তিক কৃষক : যাদের জমির পরিমাণ এক একরের নিচে। ভূমিহীন ছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবর্গের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে- যারা প্রান্তিক কৃষক। এদের অবস্থা প্রায় ভূমিহীন।

পূর্ববঙ্গের কৃষক শ্রেণীর একটা খুব বড় অংশ বেশ আগেই ভূমির মালিকানার দিক থেকে প্রান্তবর্তী অবস্থানে এসে ঠেকেছিল। '১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের সময়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকের ছিল স্বল্প পরিমাণ জমি- গড়ে পাঁচ একর বা তার চাইতেও কম'।[৪] ডব্লু ডব্লু হান্টার বহুকাল পূর্বে এ পরিমাণ জমিধারীর আবস্থানকে বলেছেন নিম্ন স্তরের। '১৯৪৭-এ বা তার পরে যে কৃষকের জমির পরিমাণ ছিল এতটা, তার অবস্থান একেবারে প্রান্তবর্তী। আর এ-অবস্থান থেকে এ প্রান্তিক কৃষকেরা আরো নিম্নের দিকে গেছে; তাদের অবস্থা হয়েছে শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর। ফসলের স্বল্পতা, ঋণগ্রস্ততা, জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদি নানা সমস্যায় আক্রান্ত প্রান্তিক কৃষক এক পর্যায়ে জমি হারিয়ে পরিণত হয়েছে ভূমিহীনে। স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে, পঞ্চাশের দশক থেকে ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষকদের জমি হারানো দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে যায়। এদের ভূমি হারানোর প্রক্রিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত। ক্ষুদ্র কৃষকদের ভূমি হারানোর অনেকগুলো কারণের মধ্যে দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার চাপ সর্বাপেক্ষা প্রকট। বিশেষ করে একদিকে মাথাপিছু জমির স্বল্পতা, অন্যদিকে জনসংখ্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্টি হয় দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যা সংকুল পরিস্থিতি। নির্দিষ্ট জমিকে কেন্দ্র করে জনসংখ্যার চাপে সৃষ্ট উত্তরাধিকারীদের প্রবৃদ্ধির ফলে কালে কালে জন্ম নিতে থাকে নতুন ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণী'[৫]। গ্রামাঞ্চলের এসব অভাবী মানুষ দুর্যোগপূর্ণ সময়ের মোকাবেলায় দ্বারস্থ হয় সমাজের অবস্থাপন্নদের। মহাজন-জমিদারের কাছে জমি বন্ধক রেখে সে অর্থ ঋণ নেয়; পরে তাকে সেই জমি নিজের অধিকারে ফিরিয়ে আনতে হয় চড়া সুদের বিনিময় মূল্যে। তখন তার অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, কখনো-কখনো নিজেরই আইন সঙ্গত জমিতে সে পরিণত হয় বর্গাচাষীতে; আর বন্ধককৃত জমিও সে ফিরে পায় না। সমাজ গবেষণা ভিত্তিক এক জরিপ থেকে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের গ্রামের ৭৫ শতাংশ ভূমিহীনই একসময় ভূমির অধিকারী ছিল। তাদের পিতা কিংবা পিতামহদের প্রধান পেশা ছিল কৃষি। অর্থাৎ কয়েক যুগ পূর্বেও যারা কৃষি জমির মালিক কয়েক যুগ পরে এসে তারা ভূমিহীন, দিন মজুর কিংবা ভিক্ষুকে রূপান্তরিত। এ থেকে বোঝা যায়, ক্ষুদ্র চাষীদের স্বল্প পরিমাণ জমি কখনই তাদের জীবনের চাহিদা মেটাতে পারেনি। ফলে তারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষক কিংবা জমির মালিকের মুখাপেক্ষী। পরনির্ভরতা থেকে তারা ক্রমশ পরিণত হয়েছে দুঃস্থ মানুষে। একদিকে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ভূমি হারাতে থাকে, অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণীর লাভের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পরেও দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের ৬৫,০০০ গ্রামে নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীতে ভূমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যম কৃষক : এদের জমির পরিমাণ তিন থেকে সাত একরের মধ্যে। এরা সুবিধাবাদী এবং সুযোগ পেলেই ছোট ও প্রান্তিক কৃষককে শোষণ করে নিজেদেরকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

ধনী কৃষক : এদের জমির পরিমাণ সাত একর থেকে অনেক বেশি। এরা সরাসরি কৃষিকাজের সাথে যুক্ত হয় না। ব্যবসা, বাণিজ্য, গ্রামীণ রাজনীতি এরাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদের অনেকেই শহরে বাস করে। অপরদিকে বাংলাদেশের শহর সমাজে শ্রেণী বা স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা বা সম্পদ, ক্ষমতা ও শিক্ষা প্রভৃতি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব উপাদানের ভিত্তিতে শহর সমাজ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন :

১. উচ্চ বিত্ত : এদের মধ্যে পড়ে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও উচ্চপর্যায়ের শিক্ষিতগণ এই শ্রেণীর অন্ত-র্ভুক্ত। মানসিক ও কায়িক শ্রমে কর্মরতদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের দরুন বুদ্ধিজীবীরাও একটি স্বাধীন সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে টিকে থাকে। মননকার্যে নিয়োজিতদের নিয়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গঠিত।
২. উচ্চ মধ্যবিত্ত : এরা পেশাদার ডাক্তার, ক্লিনিকের মালিক, প্রকৌশল ফার্মের মালিক, বিদেশী প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবী, মাঝারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী।
৩. মধ্যবিত্ত : এরা হল সীমিত আয়ের মানুষ, যেমন- ডাক্তার, অধ্যাপক, আইন ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, সরকারি কর্মচারী, শিল্পী-সাহিত্যিক ইত্যাদি।
৪. নিম্ন মধ্যবিত্ত : এই শ্রেণীর আওতায় আসে স্কুল কলেজের শিক্ষক, চাকুরিজীবী। মূলত এদের অবস্থান নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মাঝে। প্রধানত স্বল্প বেতনের চাকুরিজীবী ও ছোট পুঁজির ব্যবসায়ী।
৫. নিম্নবিত্ত : শহরের দিনমজুর, রিক্সাচালক, মুটে, ফেরিওয়ালা, ইটভাঙ্গে যারা, ঠেলা গাড়ি চালক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক। এছাড়া আছে আরো শহর অঞ্চলের নানা ভাসমান মানুষ।

শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনার পর আসে শ্রেণীচেতনা ধারণাটির বিশ্লেষণ:

শ্রেণী-চেতনা

শ্রেণী-চেতনা ধারণাটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণী, এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর সম্পর্ক, শ্রেণীভেদে বিরাজমান বৈষম্য এবং স্ব-স্ব শ্রেণী অস্তিত্ব রক্ষা ও মুক্তির লক্ষ্যে জাগ্রত চেতনা বা সজাগ উপলব্ধিজাত চেতনার সমষ্টিকেই মূলত শ্রেণীচেতনা বলে।

শ্রেণী-চেতনার সদর্থক ভূমিকা সামাজিক প্রগতির লক্ষ্যে পরিচালিত। উপন্যাস সাহিত্যে শ্রেণীচেতনার রূপায়ণ বা প্রতিফলনের ক্ষেত্রে "শিল্পী সাহিত্যিকেরা সমাজের দ্বান্দ্বিক নিয়মে বিকাশ প্রাপ্ত সামাজিক বাস্তবতার দ্বন্দ্বাকীর্ণ জটিল অবস্থায় দাঁড়িয়ে সংশয়ের পীড়ন ও সংশয় মুক্তির প্রয়াস থেকে কল্পনা করেন সম্ভাব্য এক নতুন মানব পরিস্থিতি যেখানে মানবজীবনের মহত্তম সম্ভাবনাসমূহ সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। উক্ত বোধ বা চেতনায় প্রাণিত হয়ে তাঁরা এমন সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টি করেন যেগুলো জনগণকে জাগিয়ে তোলে, তাদের মধ্যে উদ্দীপনার আগুন জালিয়ে দেয় এবং পরিবেশের পরিবর্তন সাধনে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে ও সংগ্রাম চালাতে অনুপ্রাণিত করে।"[৬]

Dhaka University Institutional Repository

"সেই সঙ্গে শিল্পী সাহিত্যিক, স্বাপ্নিকেরা শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সচেতনভাবে হোক বা অসচেতনভাবে হোক, কোন না কোন শ্রেণীতে অবস্থান করেন এবং নিজের বক্তব্য, কর্ম ও আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেন। লক্ষ করলে দেখা যায়, মহান শিল্পী সাহিত্যিক স্বাপ্নিকেরা যে শ্রেণীর উত্তরাধিকার নিয়ে কিংবা যে শ্রেণীতে অবস্থান করে জীবনযাপন করেন, নিজেদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই শ্রেণীকে তাঁরা অতিক্রম করে যান।"[৭] ফলে নিজেদের সৃষ্টির সাহায্যে তাঁরা শ্রেণী নিপীড়িত সমাজ জীবনের দুঃখ-দুর্দশা মুক্ত সমৃদ্ধ পৃথিবীর সৃষ্টিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে চান।

সামজিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে দেখা যায়, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্বও হয় শ্রেণী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আবার সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীর চেতনাগত পার্থক্য লক্ষ করলেও দেখা যায় মানুষের অন্তরে শ্রেয়-প্রেয়, ন্যায়-অন্যায় ও উচিত-অনুচিতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন এবং মানবসমাজে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার বিরোধও চির চলমান। এই দ্বন্দ্বে, এই বিরোধে প্রগতির ভূমিকায় অংশ নেওয়াও শ্রেণী চেতনার সদর্থক পরিচয় দান করে।

আবার আমরা এও দেখি, ব্যক্তির আত্মশক্তি ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে সব সমাজে পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামন্ততান্ত্রিক বা ঔপনিবেশিক, ধনতান্ত্রিক বা নয়া ঔপনিবেশিক যেই ব্যবস্থাই হোক সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজের অপরাপর শ্রেণীর মানুষদের প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার সুদৃঢ় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি করে রাখে। কিন্তু এইসব প্রতিরোধের ব্যূহ ভেদ করেও সংগ্রামী মানুষদের প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করে। এভাবেই সব কালে শ্রেণী চেতনার অসাধারণ মানবিক ও দৃঢ় ভূমিকা জয়যুক্ত হয়ে থাকে।

এ ছাড়া সামজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সক্রিয়তা, নিষ্ক্রিয়তা ও সচেতন-অসচেতন ভূমিকার মধ্যেও শ্রেণী-চেতনার পরিচয় প্রকাশ পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা শ্রেণীচেতনার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হই। আর শ্রেণীচেতনা যেহেতু তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে জন্মে এবং বিকাশ লাভ করে; সে কারণেই বিষয়টি সরাসরি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাথে সম্পৃক্ত। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা সমাজতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী শ্রেণী-চেতনা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানবমুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের জন্ম। এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরন। আধুনিক ধনতন্ত্র নির্ভর বুর্জোয়া সমাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই হল, গোটা সমাজ দ্বন্দ্বরত দুই শত্রুশিবির বা শ্রেণীতে বিভক্ত। "একটি বুর্জোয়া এবং অপরটি প্রলেতারিয়েত। বুর্জোয়া বলতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণী বোঝায়, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপায় গুলির মালিক এবং মজুরি শ্রমের নিয়োগকর্তা। আর প্রলেতারিয়েত হল আজকালকার মজুরী শ্রমিকেরা, যারা উৎপাদনের উপায় নিজেদের হাতে না থাকার দরুন বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয়।"[৮] শাসক ও শোষিতের উক্ত দ্বন্দ্বরত অবস্থানের সূত্র ধরে কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন- "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। ... ... এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে; প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলোর সকলের ধ্বংস প্রাপ্তিতে।"[৯]

সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণীবিরোধ শেষ হয়ে যায়নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামের নতুন ধরণ। বুর্জোয়া যুগের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, শ্রেণীবিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দু'টি বিশাল শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছে, ভাগ হয়েছে পরস্পরের সম্মুখীণ দুই বিরাট শ্রেণীতে - বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত।

সমাজে বিদ্যমান প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর ঐতিহাসিক পটভূমি বিচার করলে আমরা দেখি, সাম্রাজ্যবাদীরা কৌশল পরিবর্তন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে উপনিবেশবাদকে বাতিল করে সাহায্য ও লগ্নি পুঁজির মাধ্যমে পূর্ববর্তী উপনিবেশগুলিকে যখন তাদের নয়া উপনিবেশে পরিণত করলো তারপর থেকে ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দুটি অংশ ক্রমশ অধিকতর নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া অপরটি জাতীয় বুর্জোয়া।

১. মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া

মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বলতে তাদেরকেই বুঝায়, যারা সাম্রাজ্যবাদের অনুগত, যারা সম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজসের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধার করে। এই শ্রেণীর বুর্জোয়া সামন্ত স্বার্থের সাথেও ঘনিষ্ঠসূত্রে জড়িত থাকে।

২. জাতীয় বুর্জোয়া

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র এদিক থেকে স্বতন্ত্র। তারা সতেরো, আঠারো, উনিশ শতকের ইউরোপীয় বুর্জোয়াদের মতো স্বাধীন বিকাশের পক্ষপাতী। তারা জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন অথবা বিপন্ন করে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধারের বিপক্ষে। এ জন্যেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব। একদিকে যেমন দেশীয় বাজারের বিকাশ ও বিস্তৃতিতে তারা উৎসাহী অন্যদিকে তেমনি সেই বাজারে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশ ও আধিপত্যেরও তারা বিরোধী। এজন্যই তারা সামন্তবাদ ও অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধী। জাতীয় স্বার্থের প্রতি তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাদেরকে জাতীয় বুর্জোয়া বলা হয়।

ঔপনিবেশিক এবং নয়া ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় বুর্জোয়াদের সংঘর্ষ শুধু সামন্তবাদের সঙ্গে নয়, সে সংঘর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গেও। সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তারা বিরোধে লিপ্ত হয়ে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে চায়; তাকে তারা বৈদেশিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়।

উনিশ শতকে ইউরোপে যে বিপ্লব শুধু সামন্তবাদকে পরাভূত করে সম্ভব হয়েছিল, বর্তমানে আমাদের দেশে সে বিপ্লবকে সম্ভব করতে হলে শুধু সামন্তবাদ নয়, সাম্রাজ্যবাদকেও সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে তা সম্ভব করতে হবে। সেই সাথে এই দুই শত্রু এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্ত মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদেরকে দাবিয়ে দিয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বুর্জোয়া শ্রেণী মূলত, ব্যক্তি ও ব্যক্তিমূল্যকে পরিণত করে তোলে বিনিময় মূল্যে। অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে দাঁড় করে একটি মাত্র স্বাধীনতা তা হল অবাধ বাণিজ্য।

মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইন বিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরি ভোগী শ্রমজীবী রূপে।

Dhaka University Institutional Repository

সকল উৎপাদন যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সভ্যতায় টেনে এনেছে সমস্তই এমন কি অসভ্যতম জাতিকেও। ইতিহাস পর্যবেক্ষণে দেখি যে জগদ্দল কামান দেগে সে সমস্ত চীনা প্রাচীর চূর্ণ করে, অসভ্য জাতির অতি একরোখা বিজাতি বিদ্বেষকেও বাধ্য করে আত্মসমর্পণে তা হল তার পণ্যের সস্তা দর। এভাবে সকল জাতিকে বাধ্য করে তার বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করতে। অর্থাৎ বাধ্য করে তাদের বুর্জোয়া বানাতে, এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণী চায় নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তুলতে।

সেজন্য গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণী শহরের পদানত করে সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর এবং এইভাবে জনগণের এক বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রামজীবনের মূঢ়তা থেকে। গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনই বর্বর বা অর্ধবর্বর দেশগুলোকে দাঁড় করেছে সভ্য দেশগুলোর উপর। কৃষিনির্ভর জাতিকে করেছে বুর্জোয়া প্রধান জাতির, পূর্বাঞ্চলকে করেছে পশ্চিমাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল।

দেখা যায় যে, উৎপাদন ও বিনিময়ের যেসব উপায়কে ভিত্তি করে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের গড়ে তুলেছে, তাদের উৎপত্তি সামন্ত সমাজের মধ্যে। উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্ত, সামন্ত কৃষি ও হস্তশিল্প কারখানার সংগঠন, এক কথায় মালিকানার সামন্ত সম্পর্কগুলি আর কিছুতেই বিকশিত উৎপাদন শক্তির সঙ্গে যখন খাপ খেল না তখন সে শৃংখল ভেঙ্গে ফেলা হল। সে জায়গায় এগিয়ে এল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেই সঙ্গে তারই উপযোগী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। শিল্পের মালিক কর্তৃক মজুরের শোষণ খানিকটা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র অর্থাৎ তার মজুরির টাকাটা পাওয়া মাত্র, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর অপরাপর অংশ বাড়িওয়ালা, দোকানদার, মহাজন প্রভৃতি। মধ্য শ্রেণীর নিম্ন স্তর -ছোটখাট ব্যবসায়ী, দোকানদার, সাধারণত ভূতপূর্ব কারবারিরা সবাই হস্তশিল্প এবং চাষীরা তারা ধীরে ধীরে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নেমে আসে। তার এক কারণ, যতখানি বড় আয়তনে আধুনিক শিল্প চালাতে হয় এদের সামান্য পুঁজি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং প্রতিযোগিতায় বড় পুঁজিপতিরা এদের গ্রাস করে ফেলে; অপর কারণ, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির ফলে এদের বিশিষ্ট নৈপুণ্যটুকু অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রলেতারিয়েতের পুষ্টি লাভ হতে থাকে জনগণের প্রতিটি শ্রেণী থেকে আগত লোকের দ্বারা।

আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি যেসব শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু প্রলেতারিয়েত হল প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অপর শ্রেণীগুলি আধুনিক যন্ত্রশিল্পের বিশিষ্ট ও অপরিহার্য সৃষ্টি।
নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছোট হস্তশিল্প কারখানার মালিক, দোকানদার, কারিগর, চাষী এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্যশ্রেণীর টুকরো হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য। তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল।

তথাপি শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে যেতে হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম শুরু হয় বলতে গেলে জন্ম মুহূর্ত থেকে। প্রথমটা লড়াই চালায় বিশেষ বিশেষ মজুরেরা। তারপর লড়তে থাকে গোটা ফ্যাক্টরির মেহনতিরা, তারপর কোনও একটা অঞ্চলের একই পেশায় নিযুক্ত সকল শ্রমিকেরা তাদের সাক্ষাৎ শোষণকারী বিশিষ্ট পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় উৎপাদনের উপকরণ; উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থাটা নয়। যে আমদানি মাল তাদের মেহনতের সাথে প্রতিযোগিতা করে সেগুলি তারা ধ্বংস করে, কল ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়, কারখানায়

Dhaka University Institutional Repository

আগুন লাগায় বাস্তবিকভাবে মেহনতকারীর যে মর্যাদা লোপ পেয়েছে, গায়ের জোরে চায় তারা তা ফিরিয়ে আনতে।

সুতরাং এই পর্যায়ে মজুরেরা লড়ে নিজেদের শত্রুর বিপক্ষে নয়, শত্রুর শত্রু অর্থাৎ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবশিষ্টাংশ, জমিদার, শিল্প বহির্ভূত বুর্জোয়া, পেটি (মধ্য শ্রেণীর) বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় ইতিহাসের সমস্ত গতিটি বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতের মুঠোয় থাকে; এভাবে প্রলেতেরিয়েতরা শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃত বিজয় অর্জনে বাধাগ্রস্ত হয়।

শেষ পর্যন্ত শ্রেণী সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তে, তখন শাসকশ্রেণীর মধ্যে বস্তুতপক্ষে পুরানো সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে যে ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া চলে তা এমন একটা প্রখর হিংস্র রূপ নেয় যে, শাসকশ্রেণীর একটা ছোট অংশ পর্যন্ত ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। হাত মেলায় বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে, সেই শ্রেণীর সঙ্গে যার হাতেই ভবিষ্যত। সুতরাং আগেকার এক যুগে যেমন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর দিকে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি এখন বুর্জোয়াদের একটা ভাগ যোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে। বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের কিছু কিছু যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের তুলতে পেরেছে। এ কারণে কার্ল মার্কস বলেন, 'আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে, তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।'[১০]

শ্রেণীসংগ্রাম হল "বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম, যাদের স্বার্থ পরস্পরের পরিপন্থী বা বিরোধী, এটি বৈরগর্ভ শ্রেণী সমাজ বিকাশের মূল আধেয় ও চালিকাশক্তি ।"[১১]

সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষ শোষণে জর্জরিত হয়ে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয় তাদের উপর থেকে শোষণের বোঝা নামিয়ে ফেলার জন্য শোষকশ্রেণীর উপর আঘাত হানে। যে কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এ আঘাত এবং প্রত্যাঘাতের ক্রমান্বিত প্রক্রিয়াটির নামই শ্রেণীসংগ্রাম। সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি জনগণের বিজয়কে বেশিদিন অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

'মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, বৈরগর্ভ সমাজের গঠনরূপগুলিতে শ্রেণীসংগ্রামই সমাজ বিকাশের চালিকাশক্তি। সমাজ বিবর্তনের একটি পর্যায়ে শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্যভাবে সমাজ বিপ্লবে পর্যবসিত হয় । আর বিপ্লব হল শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়, যখন বিপ্লবী শ্রেণীটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো হয়। সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে পুরনো থেকে নতুন সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনরূপে উত্তরণ ঘটে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রগতি অর্জিত হয়। সমাজ বিকাশের জরুরী কাজ সম্পাদনে বৈপ্লবিক শ্রেণী সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই।'[১২]

শ্রেণীসংগ্রামের বিশেষ একটি দিক হল সাংস্কৃতিক শ্রেণীসংগ্রাম। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিত্তকে শোষকদের শাসন মুক্ত করা বা রাখার সংগ্রাম জনগণের সাংস্কৃতিক শ্রেণীসংগ্রাম। এই সংগ্রাম যতদিন না কোন দেশে ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয় ততদিন কোন রাজনৈতিক সংগ্রামও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় না।

শ্রেণীসংগ্রাম সংগঠিত হবার নেপথ্যে শাসকশ্রেণী কর্তৃক আরোপিত যেসব শক্তিশালী উপকরণ বা উদ্দেশ্য প্রভাব ফেলে তার মধ্যে মেহনতি জনগণের সৃজনশীলতা, তাদের মানসিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে রোধ করাই হয়ে দাঁড়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শোষকশ্রেণীর সংস্কৃতি চর্চার মুখ্য দিক। মেহনতি জনগণের চিত্ত শাসনই তার মূল লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে তাদের কৌশল হল মেহনতি জনগণের চিন্তা চেতনার

Dhaka University Institutional Repository

উপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। পুরাকালে ভারতবর্ষে শোষকশ্রেণী এই নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিল তার নাম হল জন্মান্তরবাদ। শোষক শ্রেণী পূর্বজন্মের পাপের ফল ভোগ করার দর্শন দিয়ে মেহনতি জনগণের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার স্পৃহাকে দমিয়ে রাখত। সমজের নিচু শ্রেণীতে হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী তারা মনে করত, পূর্ব জন্মের পাপের শাস্তি স্বরূপ সমাজের বিত্তবান উঁচু শ্রেণীর শাসক কর্তৃক তারা অত্যাচরিত হচ্ছে। এটি বিধির বিধান ও পাপ মুক্তির নিয়তি বলে তারা গণ্য করত। এভাবেই ধর্ম বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়ে শোষকশ্রেণী শাসন ও নিপীড়নের কৌশলকে বজায় রাখত। বর্তমান সময়েও এই অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কারকে পুঁজি করে শোষকশ্রেণীর শোষণ, নিপীড়ন কায়েম রাখার নজির কম নেই। এছাড়া জনগণকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখাও ছিল শোষক শ্রেণীসমূহের একটি সুপরিচিত কৌশল। বর্তমান সময়ের শ্রেণী বৈষম্য পীড়িত সমাজ কাঠামোয় যার দৃষ্টান্ত প্রচুর। এ ক্ষেত্রে মেহনতী জনগণের অক্ষর পরিচিতি যেখানে বন্ধ করা সম্ভব হয় না সেখানে তারা চেষ্টা করে তাদের চিন্তা শক্তির বিকাশ যাতে না হয় অর্থাৎ তারা যাতে ভাবতে না পারে। তাও যখন বন্ধ করা সম্ভব হয় না তখন তারা চেষ্টা করে ভাবনা যাতে সঠিক পথে না এগিয়ে বিপথগামী হয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে শোষকশ্রেণীর কলাকৌশল পরিবর্তন হলেও তাদের মূল লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় না। এমন কি ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য সব কিছুকেই যুগে যুগে কাজে লাগনো হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যালঘিষ্ঠের শোষণ শাসন কায়েম রাখার উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলিকে কেন্দ্র করে ।

ঠিক এ কারণে কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষের সৃষ্টিশীলতা এবং সাধারণভাবে জনগণের চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বলতে যা কিছু বোঝায় সেটিই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সীমাবদ্ধ থাকে, শোষক শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে। জনসংখ্যার অধিকাংশের সৃষ্টিশীলতা তাই দেখা যায় সমাজের ভিত্তিভূমিতে অর্থাৎ উৎপাদন কাঠামোতে। জনগণের এই বিপুল সৃষ্টি ক্ষমতার প্রতিফলন উপরি কাঠামোতে যাতে না ঘটে তার জন্য শোষকশ্রেণী থাকে সদা সতর্ক। তাঁর জন্য তারা আবিষ্কার করে চলে নিত্যনতুন কৌশল।

পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, মানব জাতির মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধারণভাবে শোষকশ্রেণীসমূহ এবং বিশেষভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী যতখানি ঘটিয়েছে তার থেকে অনেক বেশি করে তারা বাধা প্রদান করেছে, সেই বিকাশকে গভীর ও ব্যাপক করার ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা যায়। ১৯৪৭ পরবর্তী 'উর্দু' রাষ্ট্রভাষা দাবির মূলেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারকে পুঁজি করে গঠিত কৌশল বুর্জোয়া শ্রেণী শাসনের স্বরূপ চিহ্নিত করে।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মেহনতি জনগণের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্ভাবনা তাই নিতান্তই ক্ষীণ। শুধু অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আজ বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ তথা নয়া উপনিবেশবাদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়। এই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রচারণা। এই প্রচারণাও সাম্রাজ্যবাদী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার অন্যতম হাতিয়ার। এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এখন বিরাজ করছে এক গভীর নৈরাজ্য ও দিকশূন্যতা।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ শাসিত নয়া উপনিবেশে পরিণত বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের মূল পরিচয়কে 'দারিদ্র্য' -এর মধ্যে আটকে ফেলাতে দেশী ও আর্ন্তজাতিক উভয় শাসকশ্রেণীরই বিশেষ আগ্রহ ধরা পড়ে। এই জনগোষ্ঠী তাই পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শাসিত শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিতে সক্রিয় সৃজনশীল জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই, তাদের পরিচয় তারা দরিদ্র, তাদের কেবলই পয়সার

Dhaka University Institutional Repository

অভাব। আমাদের দেশে এই পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের কারণে দারিদ্র্য দূরীকরণে দেশ ছেয়ে গেছে এনজিও সংগঠনে। উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, ধর্ম, আর দারিদ্র্য বিমোচনের বাণিজ্য কিংবা প্রহসন থেকে রাষ্ট্রের কোমরে বাঁধা প্রান্তটি যে পুঁজিবাদী শক্তির হাতে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজ সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছিন্ন, শ্রেণীবৈষম্যের চিত্রই এখানে প্রধান। এদেশে অধিকাংশ লোক যে খাবার খায়, অতি অল্প কিছু লোকের কুকুরও এর চেয়ে পুষ্টিকর খাবার খায়। নদীমাতৃক এই দেশে গ্রামের শ্রমজীবীরা গ্রীষ্ম কালে যে পানি পান করে, এই সোনার দেশেই কিছু ভদ্রলোকেরা তা দিয়ে শৌচকার্য করার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। এই বৈপরীত্য আমদের সামজের অলি-গলি, আনাচে-কানাচে পরিপূর্ণ করে আছে। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভয়াবহ দারিদ্র্য আর অকথ্য জীবন সম্পর্কে একটি চিত্র মধ্যবিত্তের মাথায় আছে। এই শ্রেণীর বোদ্ধা ও লেখক শিল্পীরা সেই চিত্রে বিপর্যস্ত হয়ে মধ্যবিত্তের গুমোট, অতিশয় কিলবিলে, স্যাঁতস্যাঁতে, আত্মপ্রতারণার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ অনেকটা এগিয়ে এসে বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ভূমিকা পালনেরও চেষ্টা করেন।

এ দেশে অসংখ্য এরকম কর্মীর ইতিহাস রয়েছে। মধ্যবিত্তের যে অংশ বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে বিভাগোত্তর কাল থেকে গত কয়েক দশকে অনেক লড়াই-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা অতিক্রম করেছেন, তাঁরা শ্রেণী সচেতন বিপ্লবী পরিচয়কে ধারণ করে আছেন। একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে আসা রাজনৈতিক কর্মী, সম্পত্তিহীন শ্রমজীবী নারী পুরুষ, প্রত্যেকেরই ভূমিকা হয়ে ওঠে শ্রেণী-চেতনা সম্পৃক্ত নিষ্পেষণহীন সামাজিক বঞ্চনামুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

এ লক্ষ্য পূরণে যে বাস্তবতা দৃশ্যমান তা হল জনগণের সংস্কৃতি বিকাশের প্রতিবন্ধকতা এবং তাদের অর্থনৈতিক জীবনের শোষণ মুক্তির প্রতিবন্ধকতা অভিন্ন। ঠিক এ কারণেই মেহনতি জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের সংগ্রাম তাদের অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনার বৈপ্লবিক ভূমিকা এই যোগসূত্রকে সঠিকভাবে সক্রিয় করে নির্বিশেষ জনগণের জন্য সৃষ্টি করতে চায় শ্রেণী বিভক্ত সমাজ উচ্ছেদের মাধ্যমে শ্রেণীহীন, শোষণহীন একটি সুস্থ সমাজব্যবস্থা। শ্রেণী-চেতনার মহৎ ভূমিকা এভাবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে অভিন্ন যোগসূত্র স্থাপন করে সামাজিক প্রগতি নিশ্চিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও সূত্রনির্দেশ

[১] মহিবুল আজিজ, বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ, পৃ: ১৫।

[২] জ. বেরবেশকিনা, দ. জেরকিন, ল. ইয়াকভলেভা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?, প্রগতি প্রকাশন মস্কো, পৃ: ৯২।

[৩] আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ: ৬৪-৬৫।

[৪] রিচার্ড নেশন্স, পাকিস্তান: ক্লাস এ্যান্ড কলোনী, নিউ লেফট রিভ্যু, ১৯৭১, নং: ৬৮ পৃ: ৬ ।

[৫] অনুপম সেন, বাংলাদেশ: রাষ্ট্র ও সমাজ, ঢাকা, সাহিত্য সমবায়, ১৯৮৮, পৃ: ১০২-১০৪।

[৬] মহৎ শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে মাওসেতুং-এর অভিমত: Mao Setung/'Talks at Yenan Forum' Page-82.

[৭] আবুল কাশেম ফজলুল হক, 'উনিশ শতকের মধ্য শ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য', পৃ: ৫৭-৫৮।

[৮] ১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণে এঙ্গেলস এর টীকা, কমিউনিস্ট ইশতেহার।

[৯] কার্লমার্কস ও ফ্রেড্রিকস এঙ্গেলস রচনা সংকলন, ২য় খণ্ড, প্রথম অংশ।

[১০] কার্ল মার্কস ও ফ্রেড্রিকস এঙ্গেল্স, রচনা সংকলন, ২য় খণ্ড, ১ম অংশ (কম্যুনিস্ট ইশতেহার বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত অংশ, পৃঃ ৩৪-৪৭)।

[১১] পূর্বোক্ত, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কি?, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃ: ৭৬-৭৭।

[১২] পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার পটভূমি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার পটভূমি

আধুনিক সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জীবন ঘনিষ্ঠ রূপায়ণে জীবনের বহুভঙ্গিম বাস্তবতার দ্বন্দ্বাকীর্ণ সফল শিল্পরূপ হল উপন্যাস। উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত ঔপন্যাসিকের শ্রেণীগত পরিচয়, ভূমিকা এবং তাঁদের সৃষ্টিকর্মে বিধৃত শ্রেণীচেতনার ক্রমবিকাশের পরিচয় লাভ করতে হলে এ কালের সামাজিক রূপান্তর ও বিবর্তন সম্পর্কে জানা দরকার। বৃহৎ বাংলার নবাবি শাসনের অবসান এবং ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা, পুরাতন সামন্তশ্রেণীর বিলোপ এবং মুৎসুদ্ধি জমিদার, চাকুরীজীবী-ব্যবসায়ী মহাজনদের নিয়ে গঠিত নতুন মধ্য শ্রেণীর উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লক্ষ করলে স্পষ্টতই বাংলাদেশের সামাজিক শ্রেণী রূপান্তরের ধারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সৃষ্ট নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব প্রসঙ্গে ইংরেজ শাসকদের প্রতিনিধি টি. বি. মেকলে'র উক্তি স্মরণযোগ্য:

"এখন আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী গড়ে তোলার জন্য যে শ্রেণীর লোকেরা হবে আমাদের ও আমরা যে কোটি কোটি লোককে শাসন করছি সেই শাসিতদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানকারী; এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা হবে রক্তে ও রঙে ভারতীয় আর রুচিতে, মতে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ।"[১]

লর্ড বেন্টিংকের আমলে, ১৮৩৫ খ্রি:, এদেশে ইংরেজি মাধ্যমের যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, শাসকদের দিক থেকে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছিল মেকেলের উল্লিখিত উক্তির মধ্য দিয়ে। আর উক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়েই ইউরোপীয় বুর্জোয়া ধ্যান ধারণার সঙ্গে বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর পরিচয় এবং তাদের মধ্যে প্রচলিত পুরাতন ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা ও ধ্যান ধারনার পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারাসমূহের সূচনা, প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ঘটে। বস্তুত, ইংরেজ আমলের মধ্যশ্রেণীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রতিটি অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে বিকশিত হয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্য। মূলত এই মধ্য শ্রেণীর বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যেই অন্তর্লীন ছিল আধুনিক সাহিত্য ও একালের সামাজিক রূপান্তরের মূল উৎস ধারা। মধ্যশ্রেণীর বিকাশের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে এরকম: "আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বহুকালের প্রচলিত ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসোম্মুখ সামাজিক শ্রেণীর প্রাথমিক উপাদান সমূহের অঙ্কুরোদগম হয়। আঠারো শতকের সমান্ত-শাসনের চাপ থেকে মুক্ত হবার ও অবাধ বিকাশের আকাঙ্ক্ষায় মধ্যশ্রেণী বাংলাদেশে আগত ইউরোপীয় বণিকদের সাথে আঁতাত করতে গিয়ে খাল কেটে কুমীর আনে এবং দেশকে পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত করে। আঠারো শতকের অন্তিমপাদে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) পরে এই শ্রেণী একটি ঐতিহাসিক যুগের জন্য নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত করে নেয়, এবং নব্য-জমিদার-চাকুরিজীবী-ব্যবসায়ী-মহাজন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র উনিশ শতক ধরে এই শ্রেণী পরাধীন স্বদেশে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বদেশের সম্পদ বিদেশী শাসক-শোষকদের হাতে তুলে দিয়ে সেই শাসক-শোষকদের উচ্ছিষ্ট লাভ করে বিকশিত হয়। এই শ্রেণীর একাংশ ইউরোপীয় বুর্জোয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই আলোকে বিদেশী শাসকদের সহযোগিতায় পরাধীন দেশের-স্বদেশের পশ্চাৎবর্তী সমাজের সংস্কার সাধনের চেষ্টা চালায়। প্রথম দিকে এই শ্রেণীতে মুসলমান উপাদানের পরিমাণ ছিল নিতান্ত কম। বিশ শতকের প্রথম পাদে মুসলমান উপাদান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে এই শ্রেণীর হিন্দু অংশ ও মুসলমান অংশ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের পেছনে শাসক ইংরেজদের বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন চালানোর নীতিও ইন্ধন যুগিয়েছিল। ১৯৪৭ সনে ব্রিটিশরাজ বিদায় নেবার সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়, এবং এই শ্রেণীর হিন্দু অংশের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত ও মুসলমান অংশের নেতৃত্বে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পূর্ব বাঙলায় এই শ্রেণী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়ে একান্ত বার্ধক্যজীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে এবং দ্রুত অধঃপতনের গহ্বরে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের সমাজ পুনরায় এক ক্রান্তিকাল বা যুগসংক্রান্তির মধ্য দিয়ে চলেছে।

কিন্তু পাকিস্তান আমলেই আবার পূর্ব বাঙলার সমাজে নতুন উপাদানের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে এবং ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই নতুন সামাজিক উপাদানসমূহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। তথাপি বাংলাদেশের সমাজ যুগসংক্রান্তিকে অতিক্রম করে কোন নব যুগে প্রবেশ করেনি, কারণ কোন নতুন সমাজব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতি এখানে গড়ে ওঠেনি। মোটামুটিভাবে এই হল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট।"[২]
উক্ত বাস্তবতাকে স্মরণ রেখে বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার পটভূমি তুলে ধরতে গিয়ে একটু পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায়, উনিশ শতকের প্রথম দিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির সামনে বিকাশের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর, এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। কিন্তু এই ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিকাশের পর বিশ শতকের প্রথম দিকে এর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটসমূহ প্রকটভাবে প্রকাশ পায় এবং প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন পৃথিবীর অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর তরুণদের মনে নিদারুন সংশয় দেখা দেয়। অথচ ভারত জুড়ে মধ্যশ্রেণীর সাধারণ লোকদের এবং বিপুল কৃষক জনতার মনে স্বাধীনতার স্পৃহা তখন প্রবল, সেই সময়টাতে ভবিষ্যত স্বাধীন দেশকে নিয়ে নানা রকম স্বপ্ন ও কল্পনা জেগেছিল তাদের মনে। এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ তখন সাহিত্যকে আলোকিত করে রেখেছেন, এবং তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা তখনও সক্রিয়। রাজনীতি, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা তখন কর্মতৎপর। ধনতন্ত্রের আদি জন্মভূমি ও লালনভূমি ইউরোপে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা তখন নিঃশেষ হয়েছে আর বুর্জোয়া সংস্কৃতির সামনেও তখন হতাশার কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের আবর্তে ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষের জীবন তখন হতাশাগ্রস্ত, ক্ষত-বিক্ষত, পঙ্গু , বিকৃত ও জড়াগ্রস্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব থেকেই ইউরোপের সাহিত্যে ও শিল্পকলায় এই অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৎকালীন ইউরোপীয় জীবন ভাবনার প্রভাব তৎকালীন বাঙালি মধ্যশ্রেণীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম হয়েছে। বাঙালি মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত তরুণদের একাংশ তখন সঙ্কটাপন্ন বিধ্বস্ত ইউরোপের অবক্ষয় ক্লিষ্ট ভাবধারা দ্বারা তীব্রভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা অনেকে ইউরোপীয় সাহিত্যের বুর্জোয়া যুগের এই অবক্ষয়ের পর্বটিকে মনে করেছিলেন ঐ সাহিত্যের একটা নতুন যুগ বলে। বাংলা সাহিত্যেও তাঁরা এর অনুসরণে এই নতুন যুগ প্রবর্তনে প্রয়াসপর হন। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকা এই আগ্রহ নিয়েই এগিয়ে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারীদের প্রতি তাদের মনোভাব ছিল বিরূপ। তাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্যের শান্ত-সমাহিত-কল্যাণকামী আদর্শকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন সৃষ্টির নতুন পথে। 'শিল্প শিল্পের জন্যই' এই তত্ত্ব এদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আর তাঁরা বিশেষভাবে সচেষ্ট ও সক্রিয় ছিলেন জীবনের অবসাদ, হতাশা, যৌনতা, নিঃসঙ্গতা, অবক্ষয়, দারিদ্র্য, পরাজয়, বিকৃতি, ক্লেদ, গ্লানি ও অস্বাভাবিকতাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিল্পায়িত করে প্রকাশ করতে। সকল প্রকার সামন্ত প্রভাব থেকেও এঁরা বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। বুর্জোয়া সভ্যতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাবে তখন তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন অবক্ষয়পূর্ব বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনভাবনার ওপর সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। প্রকৃত পক্ষে রবীন্দ্রোত্তর বাংলার মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য ও

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির এই ধরনেরই একটি স্বাভাবিক পরিণতির সম্ভাবনা ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ ও ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব এই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে। ইউরোপের ঐ সাহিত্য যে কোন নতুন ঐতিহাসিক যুগের বা নতুন সামাজিক শ্রেণীর সাহিত্য নয়, তা যে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহিত্য প্রতিনিধিদের দ্বারাই রচিত ও বুর্জোয়া যুগেরই অবক্ষয়-পর্বের সাহিত্য- এটা কল্লোল গোষ্ঠীর কর্মীরা উপলব্ধি করতে পারেননি। এ জন্যই নিজেদের সাহিত্যকে 'নবযুগ-সৃষ্টিকারী' সাহিত্য বলে প্রচার করার এবং 'কল্লোল-যুগ' কথাটাকে চালু করার এত চেষ্টা ছিল তাঁদের। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা পরবর্তীকালে সম্ভবত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় তাঁদের অবস্থান কোথায়, আর সেজন্যই হয়তো তাঁদের রবীন্দ্র-বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত আর বজায় থাকেনি।

বর্তমান শতকের তিরিশোত্তর কালে মধ্যশ্রেণীর সাহিত্যকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের রচনাবলি পাঠ করলে দেখা যায়, তাঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের শান্ত-সমাহিত মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার ধারা অনুসরণ করেছেন। তবে এই কালের শক্তিমান লেখকদের অধিকাংশই হতাশা ও অবক্ষয়ের চেতনা হৃদয়ে অনুভব করেছেন, লালন করেছেন, সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের যে জীবনপ্রেম, মর্ত- প্রীতি, মানবমহিমা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, অতীন্দ্রিয় অনুভব, জাতীয় ভাব ও আন্তর্জাতিকতার সাক্ষাৎ মেলে তাকে লালন করার মতো পরিস্থিতি উত্তরকালে ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে কবি-সাহিত্যিকেরা আত্মপ্রকাশ করেন উদীয়মান হিসেবে, তাঁদের অধিকাংশের রচনাতেও এই হতাশা ও অবক্ষয়ের চেতনাই শিল্পরূপ লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচিত মধ্যশ্রেণীর বর্তমান পর্যায়ের হতাশা ও অবক্ষয়ের অভিব্যক্তিও ঘটেছে তাদের রচনার মধ্য দিয়ে। সমাজের নিম্নস্তর থেকে, জনগণের মধ্য থেকে, শ্রমজীবী মানুষের মধ্য থেকে সাম্প্রতিক দশক গুলোতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনার প্রভাবে নবজাগরণের যেসব স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলো উক্ত লেখকদের মনে ক্ষণিক অনুভূতি ছাড়া আর কোন স্থায়ী প্রভাব ও নির্দ্বন্দ্ব আস্থার ভাব জাগাতে পারেনি।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীব্যাপী দ্রুতগতিতে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে। মার্কসীয় চিন্তাধারা ও রুশ বিপ্লবের প্রেরণা তৎকালীন বাঙালি তরুণদের একাংশের মনেও সঞ্চারিত হয়। তার ফলে ১৯২০ অথবা ১৯২১ সনে গঠিত হয় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। দেশের কৃষক জনতার মধ্যেও তখন থেকে জমিদার-বিরোধী মনোভাব ব্যাপকতর ও তীব্রতর হয়, এবং মধ্যশ্রেণীর কোনো কোনো দল কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে এগিয়ে যায়। দেশের অনুসন্ধিৎসু ও ন্যায়কামী লেখকেরা বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার নবনির্মাণ ও রুশ বিপ্লবের আদর্শ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। এ অবস্থায় বাংলা সাহিত্যেও একটা নবচেতনার ও নতুন ধারার সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অরবিন্দ পোদ্দার ও আরও অনেক কবি সাহিত্যিকের রচনার মধ্য দিয়ে মার্কসীয় এই নতুন ধারাটি বিকশিত হয়। কিন্তু চিন্তার ও সাহিত্যের এই নতুন ধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী, সংগঠিত ও ধারাবাহিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে না ওঠার ফলে এ ধারা যথেষ্ট বিকাশ লাভ করতে পারেনি।

তথাপি, বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার পটভূমি তুলে ধরতে যেয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা মার্কসীয় চেতনার অনুপ্রবেশ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কিভাবে ঘটে তার আলোচনা প্রাসঙ্গিক। এর কারণ শ্রেণী-চেতনা ধারণাটি মূলত ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা মার্কসীয় চেতনার সাথে ঘনিষ্টভাবে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ত। এ কারণে বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় চেতনার প্রভাব বা পটভূমি জেনে নেয়া দরকার।

বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় চেতনার প্রভাব বা পটভূমি

আধুনিক সমাজতন্ত্রের মূল প্রবক্তা জার্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্কস (১৮২০-১৮৮৩) তাঁর পাশে আর যাঁর নাম স্মরণীয়, তিনি ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস। তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিপ্লব সংগঠনে ও সমাজ পরিবর্তনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে। কার্ল মার্কস প্রথম জীবনে কবিতা লিখেছেন, পরবর্তী জীবনে দর্শন রচনা করেছেন, মুক্তি আদর্শের অনুসন্ধান করেছেন। এঙ্গেলসও তাই। তবুও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁরা কখনও কখনও মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন, নতুন সত্য নির্মাণ ও মুক্তির জন্য সাহিত্য। বুদ্ধির মুক্তি অন্বেষা ছিল তাঁদের মূল চালিকাশক্তি। মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন-

- সমাজে প্রগতির জন্য, উন্নতির জন্য সাহিত্য।
- সংগ্রামী চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য সাহিত্য।

মার্কস ও এঙ্গেলস যদিও এঁরা কেউই সাহিত্য ও শিল্পকলার তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন নি, তবে বিবিধ সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অভিমত জানিয়ে তাঁরা লেখকদের কাছে প্রায়ই চিঠি লিখতেন। সে চিঠিগুলো একত্রে করলে অবশ্য একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের অভাব মিটে যায়। সে ধরণের সংকলন বেশ কয়টি প্রকাশিতও হয়েছে। তা থেকে নন্দনতত্ত্বের প্রকৃতি, শিল্পকলার সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক, শিল্পকর্মের শ্রেণী উৎস ও আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন, সমাজ ও শিল্পকলার অসম বিকাশ, বাস্তবতার সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের সম্পর্ক, ধনতন্ত্রের যুগে শিল্প সৃষ্টি ও বস্তুগত উপাদান সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রবণতা প্রভৃতি প্রশ্নে তাঁদের মতামত পুনর্গঠিত করা যেতে পারে। এছাড়া মার্কসের অপরাপর রচনায় সাহিত্য ও শিল্পকলার মৌলিক দিক নিয়ে প্রচুর মতামত ছড়িয়ে আছে। মার্কস এঙ্গেলসের টুকরো টুকরো মন্তব্য অবলম্বন করে মার্কসবাদীরা গভীরতর অনুসন্ধান করেছেন। এভাবে পৃথিবীর দেশে দেশে মাকর্সীয় সাহিত্য চিন্তার বিস্তার ও সমৃদ্ধি ঘটেছে।"[৩]

মার্কসীয় জীবনদৃষ্টি ও চেতনা অনুযায়ী জন্মের ইতিহাস থেকেই বোঝা যায় সাহিত্যে শিল্পকলার নির্যাস লুকিয়ে আছে মানবিকতার মধ্যে। সেটা সৃষ্টি হয় মানুষের দ্বারা ও মানুষের জন্য এবং বেঁচে থাকে মানুষের মধ্যে ও মাধ্যমে। তারপর মানুষ সমাজ গড়ে। প্রথম যুগের সমাজ ছিল সদস্যদের সম অধিকারের, সমবন্টনের ও সম সুযোগভোগের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত । কাল পরিক্রমায় সমাজের পরিধি বাড়লে সম্পর্ক জটিল রূপ নেয় । সমবন্টনের সুযোগ নষ্ট হয়ে অধিকাংশের উপর অল্পের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার পর এই সমাজে প্রতিটি শিশুই আটকে পড়ে শোষণের সহস্রজালে। জীবনের পথে সে যতই এগোয়, বন্ধন ততই তীব্রতা পায়। বিরূপ বিশ্বের প্রভাবে তার ব্যক্তিত্ব হয় খণ্ডিত, প্রতিভা থাকে অবিকশিত, মানবীয় সৌরভ প্রকাশের পথ না পেয়ে গুমরে গুমরে কাঁদে। সে অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার সাধনায় কার্ল মার্কস ও তার অনুসারীরা আবিষ্কার করেছেন ***কমিউনিস্ট সমাজের*** পথ। তাঁদের বিশ্বাস মতে কমিউনিস্ট সমাজে, এমনকি প্রাক কমিউনিস্ট সমাজতান্ত্রিক সমাজেও শোষণের নাগপাশ লোপ পেয়ে মানুষ যথার্থ স্বাধীনতায় উপনীত হবে। মানব বিকাশের পথ হবে দ্বিধাহীন নির্দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর অনেক প্রাচীন ধর্মেও ভগবানের কৃপায় শেষ পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হবার ভবিষ্যৎবাণী আছে। সেটা সম্ভব হবে ভগবানের কৃপায়, কিন্তু কমিউনিস্টরা তা করতে চায় সংঘবদ্ধ মানুষের বাহুবলে। সে প্রয়াসে তথা প্রচলিত সমাজের সংকট উত্তরণে প্রতিদিনের সংগ্রামে বিপ্লবীদের নিত্যসঙ্গী হবে সাহিত্য ও

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকলা। কারণ, সৎসাহিত্য মানুষকে জানায় তার অন্তহীন সম্ভাবনার কথা, তার কাছে বার্তা পৌঁছে দেয় বৃহৎ জীবনের।

দিনানুদৈনিকের গ্লানি, দুর্দশা ও প্রবলের উৎপীড়ন যে চিরস্থায়ী নয়, উদার আনন্দময় জগত রচনা যে মানুষের দ্বারা সম্ভব, সে সুসমাচার পাওয়া যায় মহৎ সাহিত্যে। মার্কস এঙ্গেলস-লেনিন ব্যতীত অন্য বিপ্লবীরাও সে কারণে দ্বারস্থ হতেন সাহিত্য জগতের কাছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুনর্গঠনকালে স্ট্যালিন স্থাপন করেছিলেন সাহিত্য শিল্পকলার জন্য পৃথক মন্ত্রাণালয়, পৃথক সংগঠন। ----- আসলে সমাজতন্ত্রীরা শিল্প-সাহিত্যকে সমাজ জীবনের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, এ থেকে তা বুঝা যায়। তারা বিশ্বাস করতেন শোষণমুক্ত নবীন পৃথিবী যখন বিকশিত হবে, তখনও বই হবে মানুষের নিত্য সঙ্গী। ***'সে সময়ে নাগরিকেরা সকালে যাবে মাছ শিকারে, দুপুরে যাবে কর্মস্থলে, কর্মক্লান্ত বিকালে সপরিবারে গোল হয়ে বসে পড়বে প্লেটোর বই'***- মার্কস ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছিলেন এভাবে।[৪]

মার্কসবাদীদের কাছে সাহিত্য রচনা তাই উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ নয়। 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বকে তারা বর্জন করেন। মানবিকতাই শিল্পের আদি উৎস বলে তারা মনে করেন। মার্কসের অনুসারীরা শিল্পীর কাছ থেকে আশা করেন দৃঢ় ভূমিকার। অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি বিধায় তিনি মানুষের দুঃখে বিচলিত হবেন। তিনি মানুষের দুঃখমোচনের সংগ্রামে এগিয়ে যাবেন। সমাজের দ্বান্দ্বিকতা আগ্রহের সাথে নিরীক্ষণ করে তিনি অবস্থান নেবেন সমাজের বৃহৎ অংশের অনুকূলে। যে শ্রমজীবী জনতা যুগযুগ ধরে সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে, অথচ সমাজে যোগ্য আসন পায়নি, তাদের দুঃখ একজন সাহিত্যিকের মনে করুণা জাগাবে। তাঁর সৃষ্টিতে তারা কথা বলে উঠবে। তিনি নিবেদিত হবেন শ্রমজীবী মানুষের জন্য সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রয়াসে। হয়ত তাকে সবসময় কথা বলতে হবে না, কিন্তু সমাজের নিরন্তর দ্বন্দ্বে তিনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের পক্ষে থাকবেন। সমাজবিকাশে এমন সময় আসে যখন শিল্পীকে সৈনিক হতে হয়। সে অবস্থা রাশিয়ায় এসেছিল, চীনে এসেছিল, আমাদের দেশেও এসেছিল ১৯৭১ সালে। সে ক্রান্তি কালে সাহিত্যিককে গণমানুষের কাতারে সামিল হতেই হবে। *এটিই লেনিনের বিখ্যাত 'পার্টিজানশিপ তত্ত্ব'*।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ধারণ করা মার্কসীয় সমালোচনা শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাহিত্য ও শিল্পকলার নতুন ধারা ও আঙ্গিকের উদ্ভব ঘটে সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের ফলে। সমাজ বিন্যস্ত দু'ভাগে উপরিকাঠামো ও অবকাঠামো। উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন সম্পর্ক দুয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় কাঠামোর স্তর। উৎপাদন উপকরণ বলতে বুঝায় উৎপাদন যন্ত্র, শ্রমজীবী মানুষ ও কাঁচামাল। আর উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা, উৎপাদিত পণ্যের বন্টনের পদ্ধতি ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্থান ও সম্পর্ক সেসবের যৌগিক ফলই ***উৎপাদন সম্পর্ক***। অবকাঠামো নির্মাণ করে উপরিকাঠামোকে। রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি অন্তর্গত উপরিকাঠামোর। সাহিত্যের সাথে সবগুলোর সম্পর্ক আছে। যেমন আছে অবকাঠামোর সঙ্গে। মার্কসবাদীদের মতে- অর্থনীতি ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা উপরিকাঠামোর সৃষ্টিশীল প্রয়াস হল সংস্কৃতি। কাঠামো বদলালে উপরিকাঠামো বদলায়, তার সাথে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সাহিত্যের আধার ও আধেয়র। *সামন্ত সমাজের সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে আছে রোমান্সমূলক কাব্য। প্রাচীনতর সমাজে শতাব্দীর সাধনায় রূপলাভ* করেছে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসী। সামন্ত সমাজ ধনতান্ত্রিক সমাজে বিবর্তিত হওয়ার সাথে নিয়ে আসে গদ্য, গীতিকবিতা ও উপন্যাস।

সমাজের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক ওতপ্রোত বলে আধুনিক বুর্জোয়া যুগের দিকে যখন বাঙালি সমাজ এগিয়ে যাচ্ছিল তখনও হেম-নবীন-কায়কোবাদ প্রমুখ পুরোনো ধাচের মহাকাব্যের আঙ্গিক নিয়ে ব্যাপৃত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকে নজির টেনে তা বোঝাতে গিয়ে কার্ল মার্কস চিহ্নিত করেছেন তার '*অসম বিকাশের তত্ত্ব।*'

ধনতন্ত্রের সঙ্গে শিল্প সাহিত্যের বিরোধের কথা মার্কস বলেছিলেন। কারণ ধনতন্ত্রের মূল কথা মুনাফা সঞ্চয়। যে দ্রব্যের যত কদর, ধনতন্ত্রীদের নিকট সে জিনিস তত মূল্যবান। শেষ পর্যন্ত মানবীয় সম্পর্কও হেরে যায় অর্থের কাছে। জড়জগৎ ও জীবজগতকে মানবিকীকরণের আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল শিল্পকলার উদ্ভবে। শিল্পের প্রেরণা চারপাশের জগতে মানবীয়তার প্রসার ঘটানো- অপরপক্ষে ধনতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পণ্যে রূপান্তরিত করা। সে জন্যে পুঁজিবাদ শিল্পের বিকাশকে বাধা দেয়, শিল্পের সাথে পুঁজিবাদের বিরোধ এখানেই।

বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় ভাবনার প্রবেশ ঘটে রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) পরে পরেই। তৃতীয় দশকের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধে বিপ্লবের কথা, সাধারণ মানুষের ছবি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা প্রভৃতি স্থান পায়। ম্যাক্সিম গোর্কির রচনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বস্তুত তিরিশের দশকের শুরুতে ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) শিল্প সাহিত্যের বিচারে মার্কসবাদের প্রয়োগ শুরু করেন। তাঁর প্রবন্ধাবলি সংকলিত হয়েছে 'সাহিত্যে প্রগতি' (১৯৪৫) নামক গ্রন্থে। সেকালে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও (১৮৯৪-১৯৬১) এ ক্ষেত্রে ছিলেন যথেষ্ট সক্রিয়। আরো ক'জন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সম্মিলিত হয়েছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞানে বিশ্বাসী কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর আর্বিভাব ঘটে।

মূলত তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত সংহতি, আত্মশক্তি, বিজলী, কল্লোল(১৯২৩), কালিকলম(১৯২৬), প্রগতি(১৯২৭), গণবাণী, নবশক্তি, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ ভট্টাচার্য, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ নতুন যুগের লেখক সৃজনশীল রচনায় তখন তুলে ধরেছিলেন সমাজের নিচুতলার জীবন যন্ত্রণা এবং বিপ্লবের সদর্থক ভূমিকা। আর এক্ষেত্রে 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে এই মাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি অতি আধুনিক লেখকগোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কল্লোল প্রায় সাত বছর চলেছিল, কিন্তু এই অল্প সময়েই পত্রিকাটি একটি প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিল। তৎকালীন তরুণ লেখকগণ রবীন্দ্র বিরোধিতার নাম করে এখানে সমবেত হয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ অনেকেই কল্লোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "কল্লোল পত্রিকায় একদল নব্য তরুণ সাহিত্যিক ও কবি নতুন সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন যুদ্ধোত্তর ইউরোপের, বিশেষত রুশ ও ফরাসি সাহিত্য থেকে। তাঁরা এমন সমস্ত সংকীর্ণ গলি পথে যাতায়াত করতে লাগলেন যে, যাঁরা সনাতনী পন্থায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা এতে প্রমাদ গুনলেন।" এই লেখকেরা তৎকালীন ইউরোপীয় আদর্শে বাস্তব জীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়কে তাঁদের রচনার উপজীব্য করলেন। কল্লোলের আদর্শেই সে সময়ে কলকাতায় 'কালিকলম' (১৯২৬) এবং ঢাকা থেকে 'প্রগতি' (১৯২৭) সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৬ সালের লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের প্রাক্কালেই মুন্সী প্রেমচন্দর সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এটি প্রতিষ্ঠায় ছিল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় উদ্যোগ। ইউরোপে প্রত্যাগত সাজ্জাদ জহির, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সচেতন প্রচেষ্টা এতে ক্রিয়াশীল ছিল। এরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রোঁলা, বারবুস, গোর্কি, ফস্টার, স্ট্যার্চ প্রমুখ মনীষীদের ফ্যাশিবাদ বিরোধী সংগ্রামের আহ্বানে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ সালের ১৮ জুন গোর্কির মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক সাজ্জাদ জহির 'গোর্কি দিবস' পালনের আহ্বান জানানোর পূর্বে, বাংলার প্রগতি লেখক সংঘের সাংগঠনিক কমিটি গোর্কির মৃত্যুতে ১৯৩৬, ১১ জুলাই এলবার্ট কমিটির রুমে একটি শোকসভার আয়োজন করে। গোর্কির এই শোকসভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।
'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ সালে। পর বছর বেরোয় 'প্রগতি' নামক সংকলন। এতে ছিল চারটি প্রবন্ধ ধূর্জটি প্রসাদের 'প্রগতি', ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'সাহিত্য প্রগতি', বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭৪) প্রগতি সাহিত্যের রূপ এবং সুরেন্দ্র গোস্বামীর (মৃত্যু ১৯৪৫) 'সাহিত্যে বাস্তব কল্পনা'। ১৯৩৯-৪০ সালে প্রকাশিত হয় বিনয় ঘোষের (১৯১৭-৮০) 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ' এবং 'নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা'। তাছাড়া ১৯৩৯ সালে মাসিক 'অগ্রণী' ও ১৯৪১ সালে সাপ্তাহিক 'অরণি' প্রকাশিত হয়ে এই ধারাকে পুষ্ট করে।
প্রকৃতপক্ষে, বাংলা ভাষায় গোর্কির 'মা' (১৯৩৩) উপন্যাসটি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত হবার পর ১৯৩৫ সালে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'অন্তঃশীলা' গ্রন্থ, ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হল মনোরঞ্জন হাজারীর কৃষক সংগ্রামকে ভিত্তি করে রচিত 'নোঙরহীন নৌকা' এবং ১৯৩৯ সালে যখন প্রকাশ পেল সদ্য কারামুক্ত গোপাল হালদারের সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরণের কাহিনী ভিত্তিক উপন্যাস 'একদা'। সবকিছু মিলিয়েই বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে মার্কসীয় চিন্তা, চৈতন্য আর তখন দুর্লক্ষ্য নয়, যুদ্ধ, দামামার সঙ্গে তাঁর হাঁটি হাঁটি পা-পা অবস্থারও অবসান ঘটতে চলেছে।

এরপর চল্লিশের দশক। এই দশকে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং মার্কসবাদী মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের দশকরূপে নিশ্চিতভাবে চিহ্নত করা যায়। প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলনে ১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে ভাটার টান লক্ষ্য করা গেলেও ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, যশোহর, ফরিদপুর, প্রভৃতি এই আন্দোলন কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবীকে প্রগতিশীল সাহিত্য তথা সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁরা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং মার্কসীয় চিন্তাচর্চায় বেশ কিছুকাল তৎপর ছিলেন।

এই চিন্তা চর্চার ফল স্বরূপ ১৯৩৯-৪০ সালে প্রকাশিত হয় বিনয় ঘোষ এর 'শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ' এবং 'নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা' নামে দু'খানি গ্রন্থ। নতুন মার্কসীয় চেতনার আতিশয্যের ফলে বিনয় ঘোষ এর সমালোচনায় বিদ্ধ হন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও সমর সেন। আর রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিত্রিত করলেন -ভাববাদী বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তা এবং আন্তর্জাতিক কল্পনাবিলাসী সৌখিন সাহিত্যের স্রষ্টারূপে। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছে বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজের শ্রেণী শৃংখল ছিঁড়বার আবশ্যকতা ছিল না। তাঁর হাতে ঐ সমাজের ভিতরই ব্যক্তি উঠল বাস্তবের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে, বাস্তবকে বাস্তবক্ষেত্রে যেন মেনে নিল; মনোজগতের রোমন্থনে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বাস্তবের সীমার বন্ধনকে জয় করে। এই হল ধনিক সভ্যতার ব্যক্তিত্ববাদের প্রচার। ধনিক সভ্যতার অন্তর্বিরোধ গোপন করা যায় না, তার শ্রেণী অনুশাসনের কাছে মানবত্বকে হার মানতেই হয়। তাকে ন্যায্য ও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতেই হবে এর জন্য ধনিক সভ্যতাকে আঘাত করো না এ যেন এমনি ধরণের কিছু।

যাই হোক, চল্লিশের দশকের শুরুতে বাংলার প্রগতি সংস্কৃতি শিবিরের অভ্যন্তরে যখন জাতীয় সংস্কৃতির অতীত আর বর্তমান নিয়ে কিছুটা বিতর্ক শুরু হতে চলেছে তখনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি এই যুদ্ধকে সম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে 'না এক পাই, না এক ভাই' মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হল প্রচার অভিযানে। স্বভাবতই আতঙ্কিত বৃটিশ সরকারের দমননীতি নেমে আসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর। ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি এড়াবার জন্য অনেক নেতা ও কর্মী বাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

হলেন আত্মগোপনের আশ্রয় নিতে। এর ফলে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'অগ্রণীর' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। প্রগতি লেখক সংঘের কাজকর্মও হয় স্তব্ধ।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রের এই আপাত শূন্যতাকে পূর্ণ করতে সেদিন অগ্রসর হয়েছিল ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সংস্কৃতি মনস্ক একদল ছাত্রকর্মী। ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি এদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে 'Youth Cultural Institute' (YCL) নামে একটি ভিন্ন সংগঠন। এই YCL সেদিন আরম্ভ করেছিল নিয়মিত সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার আসর, বিতর্কসভা, অভিনয়, পোস্টার প্রদর্শনী এবং গান। পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘ বাংলার সস্কৃতিতে প্রগতিমুখী ভাবধারা সঞ্চারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সম্ভবত YCL ছিল তার সূতিকাগার। এসব ঘটনা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়। তবে ঢাকায় মার্কসবাদী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে ঢাকার নতুন সাহিত্য ভবন থেকে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় 'ক্রান্তি' নামক প্রগতিশীল সাহিত্য সংকলন। ঐ সংকলনে ঢাকা জেলা লেখক সংঘের অন্যতম নেতা রনেশ দাশগুপ্ত 'নতুন দৃষ্টিতে উপন্যাসের' পর্যালোচনা করলেন, নৃপেনচন্দ্র গোস্বামী লিখলেন 'সাহিত্যে সৌন্দর্যবাদ'। নৃপেন বাবু তার প্রবন্ধে অসংকোচে জানালেন আমরা এমন সাহিত্য চাই না যা আমাদের হাতুড়ি পিটিয়ে মানুষ করতে পারে। আমরা বাংলা সাহিত্যে একজন গোর্কির অভ্যুদয় দেখতে চাই।'[৫] সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হওয়ায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বদলের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সর্বদেশ সর্বকালে যেসব ঝোঁক ও প্রবণতা লক্ষ করা যায়, আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ দেশের অসম বিকাশের ফলে গ্রামীণ সভ্যতা সংস্কৃতি আর নাগরিক সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে আশৈশব লালিত-পালিত ব্যক্তি মানসিকতার যে দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক সে দ্বন্দ্ব থেকে এসব বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবত কেউ মুক্ত ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও এরাই ছিলেন সাহিত্য তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণার প্রয়াসে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব।

১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন এবং এই সম্মেলনের মঞ্চেই গঠিত হয় 'ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।' সংঘের সাংগঠনিক সভাপতি রূপে নির্বাচিত হন অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং সম্পাদকের দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্থির হয় 'ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' অতঃপর 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের' শাখা হিসেবে কাজ করবে।

১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বাই সম্মেলনে গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত লেখক সংঘ ও গণনাট্য সংঘ পাশাপাশি গড়ে তোলে ব্যাপক ভিত্তিক এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাংলার সর্বস্তরের প্রবীণ ও নবীন শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এসে মিলিত হন এ দুটি সংঘের মধ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে, ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এক সম্মেলনের মাধ্যমে 'ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' নাম বদল করে আবার পরিণত হয় 'প্রগতি লেখক সংঘে'; পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। তারপর চলছে এক জীবন্মৃত অবস্থা। বাংলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার সূচনা ও সংগঠিত আন্দোলনের ইতিহাস এ রকমই। এভাবে বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী চেতনা প্রয়োগের প্রথম পর্বের অবসান ঘটে। এই পর্যায়ের লেখকেরা কমুনিস্ট পার্টির আওতায় থেকে মার্কসবাদের চর্চা করতেন। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন কম। তারা মূলত নির্ভর করতেন সাহিত্য সমাজের দর্পণ শীর্ষক ধারণাটির ওপর। যাই হোক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, এঁরাই সুদৃঢ় করলেন সাহিত্যের সমাজমুখী ধারাকে এবং প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পরাভূত করার সংগ্রামকে। সেকালে কম্যুনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় অনেক সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠে, নাট্যান্দোলন জোরদার হয়। সে পথেও মার্কসবাদী চিন্তা দ্রুত জনপ্রিয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

"১৯৪৮ সালে বেরোয় কমুনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী'। ১৯৫০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এর আটটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাতে ছিল শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলো ছিল বিতর্কমূলক- বিষয় ছিল বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্যবিচার, প্রগতিশীল ধারা নির্ণয় সম্পর্কে। বিতর্কের সমাপ্তি টানেন কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ও পত্রিকা সম্পাদক ভবানী সেন (১৯০৯-১৯৭২)। 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক উক্ত প্রবন্ধটিতে তিনি রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ধারাকে বাদ দিয়ে প্রগতির ধারা বলে স্বীকার করলেন, সিপাহী বিপ্লব ও নীলবিদ্রোহ প্রভাবিত সাহিত্য ধারাকে। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ছিল এরূপ 'রবীন্দ্রদর্শন ভারতীয় শাসকশ্রেণীর দর্শন। রবীন্দ্রদর্শনকে আক্রমণ করতে হবে শাসক শ্রেণীকে পরাস্ত করার জন্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে মার্কসবাদের বিরোধ এত প্রচণ্ড যে, প্রগতির শিবিরে তাঁর স্থান হতে পারে না।এধরণের হটকারী সিদ্ধান্ত নেবার কারণ ছিল রাশিয়ার স্ট্যালিন ও ঝদানভের ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক নীতির যান্ত্রিক অনুসরণ । যান্ত্রিক অনুসরণের ফল ভালো হয় না, ফলে প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবীরাও মার্কসীয় তত্ত্বকে সৃষ্টিশীলভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে সৃষ্টিশীল রচনায় সাম্যবাদী চিন্তার ভালো প্রভাব পড়েছে। মানিক-সুভাষ-সুকান্ত ধারাটির উদ্ভব হয় সেকালে। অনেক ভালো নাটক রচিত হয়েছে গণনাট্য সংঘের তত্ত্বাবধানে। সাহিত্য রীতির কৌলীন্য ঘুচে গিয়ে গণমুখিতার ছোঁয়া লেগেছে। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের ছবি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ধারণা সাহিত্যে এসেছে। সমাজ-পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং সাহিত্যকে সমাজের পটভূমিতে রেখে মূল্যায়ন করার রীতি জনপ্রিয় হয়।"[৬] কিন্তু এতসব সত্ত্বেও পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় এ ধারার বিকাশ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এবং বর্তমানে বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে ১৯৮০-এর দশকে এসে রাশিয়ান প্রজাতন্ত্র ভেঙ্গে যাবার পর এ ধারার গতি তুলনামূলক ভাবে স্তিমিত হয়েছে। রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রে এই ধারাকে অগ্রসর হতে হচ্ছে প্রবল বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্য দিয়ে চরম প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করে। ১৯৪৭-'৭১ কালপর্বে বাংলা উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার পটভূমির পরিচয়গত ইতিহাস মোটামুটি এরকমই।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও সূত্রনির্দেশ

[১] 'মেকলের মিনিট', ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫(উদ্ধৃত নরহরি কবিরাজ, 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা,' পৃঃ ৯৯)।

[২] আবুল কাশেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য, পৃ: ৫৭-৫৮।

[৩] সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা, ভূমিকা, পৃষ্ঠা: ২।

[৪] পূর্বোক্ত, পৃ: ৪।

[৫] ক্রান্তি, পৃষ্টা ৬৫।

[৬] সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মাকর্সবাদীদের সাহিত্য চিন্তা, ভূমিকাংশ, পৃ: ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস

'বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ' শীর্ষক মূল অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে ১৯৪৭-১৯৭১ এই সময়কালের মধ্যে শ্রেণীচেতনা বিষয়টি প্রতিনিধিত্ব করে এমন সাত জন নির্বাচিত প্রধান ঔপন্যাসিক ও তাঁদের উপন্যাস কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হল।

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)

জন্ম: সোনারঙ গ্রাম, বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ, ১৯০৭। সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। পিতা ধরণীমোহন সেন। শান্তিনিকেতনের আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর পিতৃব্য। সোনারঙ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় আগমন করেন। সেখানে যুগান্তর দলের ব্রিটিশবিরোধী গোপন রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হন। আই.এস.সি. এবং বি.এ. পাস করার পর ইতিহাসে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার জন্য গ্রেফতার (১৯৩১) হন। বহরমপুর বন্দি শিবিরে একটানা পাঁচ বছর আটক থাকেন। জেলে বসেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেল থেকে মুক্তিলাভের (১৯৩৮) পর শান্তিনিকেতনে গবেষণা বৃত্তিলাভ করেন। শান্তিনিকেতনে প্রবেশ না করে মার্কসবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সমাজতন্ত্রের পক্ষে মেহনতি মানুষকে সংগঠিত করার জন্য সোনারঙে প্রত্যাগমন করেন। কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন। ঢাকা জেলা কৃষক সমিতির নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৪৯-এ দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হন। প্রায় চার বছর কারা নির্যাতন ভোগের পর ১৯৫৩-তে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৪-র ৩০ মে পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা জারি হলে আবার গ্রেফতার হন। কিছুকাল পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দৈনিক সংবাদে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৮-এর ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে পুনরায় গ্রেফতার হন। দীর্ঘ পাঁচ বছর জেলে বাস করার পর ১৯৬৩-র শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর দৈনিক সংবাদে পুনরায় সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। এরপর ১৯৬৫-র আগস্ট থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত আবার কারাবাস ভোগ করেন। মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় যুক্ত হন সংবাদের সাথে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কলকাতায় গমন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর ১৯৭২-এ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত সত্যেন সেনের সাহিত্য-কৃতীর উল্লেখযোগ্যতা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য।

তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু যখন, তখন তিনি বয়সে পঞ্চাশ অতিক্রান্ত। পরবর্তী দু'দশক লিখেছেন অজস্র– প্রধানত উপন্যাস। তার বিষয়– সমাজ, রাজনীতি, সমকালীন ও অতীত ইতিহাস। বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ, আন্দোলন-সংগ্রামের আলেখ্যমালা ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনায়ও তিনি পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন। মার্কসবাদের শ্রেণী সংগ্রাম ও গণমানুষের মুক্তির বাণী তাঁর সাহিত্যকর্মে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। রবীন্দ্র-সংগীত ও গণ-সংগীতের তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। গণ-সংগীত রচনায় তিনি দক্ষতা প্রদর্শন করেন। সাংস্কৃতিক সংগঠন 'উদীচী'র (১৯৬৯) প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

প্রকাশিত উপন্যাস: ভোরের বিহঙ্গী (১৩৬৬), অভিশপ্ত নগরী (১৩৭৪), পাপের সন্তান (১৯৬৯), রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ (১৯৭৩), পদচিহ্ন (১৩৭৫), সেয়ানা (১৩৭৫), কুমারজীব (১৩৭৬), বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৩৭৬), পুরুষ মেধ (১৯৬৯), আলবেরুনী (১৩৭৬), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৩৭৬), উত্তরণ (১৯৭০), এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে (১৯৭১), মা (১৩৭৭), অপরাজেয় (১৩৭৭)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। উপন্যাস রচনায় তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ (১৯৭০) করেন।
মৃত্যু: শান্তিনিকেতন, ৫ ডিসেম্বর ১৯৮১।

শওকত ওসমান (১৯১৯-১৯৯৮)

জন্ম: ২ জানুয়ারি, ১৯১৭ খ্রিঃ, হুগলী জেলার সবলসিংহপুর গ্রামে। তার প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম । তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন এবং শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজে দীর্ঘদিন বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন।
একজন শক্তিশালী কথাশিল্পী হিসেবে শওকত ওসমান সুপরিচিত। তিনি বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্যানুসন্ধানী, তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও অবিরাম নিরীক্ষণ প্রয়াসী। তিনি সামাজিকভাবে যথেষ্ট সচেতন। তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মে সমাজের পরিবর্তন ধারাটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন ও অনুধাবন করেন। প্রাক-বিভাগ, বিভাগোত্তর ও স্বাধীনতা-উত্তর কালের বাংলার সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তাঁর উপন্যাস ও গল্পে স্থান পেয়েছে। অতীত ইতিহাসকেও তিনি উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬৬), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০) ইত্যাদি প্রতীকধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁর সামাজিক উপন্যাস জননী (১৯৬১) সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এছাড়া তাঁর অপরাপর উপন্যাসগুলো হল: বনি আদম (১৯৪৩), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), দুই সৈনিক (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), রাজসাক্ষী (১৯৮৫), জলাঙ্গী (১৯৮৬), আর্তনাদ (১৯৮৬) ইত্যাদি।
মৃত্যু: ১৪ মে, ১৯৯৮ খ্রি:।

সরদার জয়েন উদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬)

জন্ম: কামারহাটি গ্রাম, পাবনা, ১৯১৮। কথা সাহিত্যিক। কৃষক পরিবারে জন্ম। পিতা তাহের উদ্দিন বিশ্বাস। স্ত্রী রাবেয়া খাতুন। স্থানীয় খলিলপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৩৯) পাস করেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে আই.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর সেনাবাহিনীতে হাবিলদার ক্লার্ক পদে যোগদান করেন। দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর সামরিক বাহিনীর চাকরি থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। ঢাকায় নতুন করে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৮-এ 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী পদে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে দৈনিক সংবাদের বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির শিশু-কিশোর ম্যাগাজিন 'সেতারা' ও 'শাহীন'-এর সম্পাদক (১৯৫৫-১৯৫৬) ছিলেন। ১৯৫৮ সালে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে ইন্সপেক্টর পদে যোগ দেন। ১৯৬২-তে বাংলা একাডেমীর প্রকাশন ও বিক্রয় শাখার সহকারী অফিসার নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ন্যাশনাল বুক সেন্টার (পরবর্তীকালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)-এর রিচার্স অফিসার পদে যোগ দেন। ১৯৭২-এ উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৮-এ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে বদলি হয়ে বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান করেন। ১৯৮০-তে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক। সমকালীন সমাজের সংকট, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, গ্রামীণ সমাজের অবহেলিত মানুষের দুঃখ-বেদনা এবং জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের শোষণ–নিপীড়নের চিত্র তাঁর উপন্যাস ও গল্পে নিষ্ঠার সাথে অংকিত।
প্রকাশিত উপন্যাস ঃ আদিগন্ত (১৯৫৯), পান্নামতি (১৯৬৪), নীল রং রক্ত (১৯৬৫), অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭), বেগম শেফালী মীর্জা (১৯৬৮), শ্রীমান তালেব আলী ও শ্রীমতি ক খ (১৯৭৪), বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ (১৯৭৫)।

উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭) এবং 'অনেক সূর্যের আশা' উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭) লাভ করেন।
মৃত্যুঃ ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৬।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১)

জন্মঃ মজুপুর গ্রাম, ফেনী, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭। তিনি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। পুরো নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ। তিনি ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যাপক ও পরবর্তীতে অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন। মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৪২)। অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৪৪) ডিগ্রী লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। একই সঙ্গে রিপন কলেজে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ আগস্ট, ১৯৪৭) পর কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় আগমন করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন। রাজনীতিতে অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়ায় কিছুকাল পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকায় আগমনের পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি গণতান্ত্রিক যুবলীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নির্বাচিত হন (১৯৫১)। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় ৩ জুন, ১৯৫২ তিনি গ্রেফতার হন। প্রায় সাড়ে তিন বছর কারা নির্যাতন ভোগ করেন। ১৯৫৫-তে পুনরায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৬-র ৮ সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি হলে ১৪ অক্টোবর (১৯৫৮) আর একবার গ্রেফতার হন। প্রায় চার বছর কারাভোগের পর ১৯৬২-র সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (১৯৪৯) পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে সাংবাদিক জীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৫৮-তে দৈনিক 'সংবাদ'-এর সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ষাটের দশকে এ পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক পদে উন্নীত হন। এতে দেশপ্রেমিক ছদ্মনামে 'বিচিত্র কথা' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় রচনা করতেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ডাঃ আর আহমদের কন্যা কমিউনিস্ট কর্মী জোহরা বেগমের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ (১৯৫৮) হন। একই বছর ১৪ অক্টোবর সামরিক সরকার কর্তৃক শহীদুল্লা কায়সার গ্রেফতার হলে জোহরা বেগম ঢাকা ত্যাগ করেন। অতঃপর ১৯৬৯-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি পান্না চৌধুরীর (পান্না কায়সার) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।
তিনি ছিলেন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। জনজীবনের আলেখ্য রূপায়ণে দক্ষতার পরিচয় দেন। বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনা তাঁর উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। সারেং

Dhaka University Institutional Repository

বৌ (১৯৬২) ও সংশপ্তক (১৯৬৫) তাঁর দু'খানি বিখ্যাত উপন্যাস। রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২) তার কথাস্মৃতি। পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬) ভ্রমণবৃত্তান্ত।
'সারেং বৌ' উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬২) ও উপন্যাস রচনায় বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২) লাভ করেন।
মৃত্যু: মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দিন কয়েক পূর্বে ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর এ দেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক তাঁর ঢাকার কায়েতটুলীর বাসভবন থেকে অপহৃত হন। এরপর তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬–১৯৯৮)

জন্ম: ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ, বরিশালের কামদেবপুরে। বহুদিন দেশ ছাড়া, বর্তমানে বিদেশে কর্মরত আছেন। তার প্রথমে নাম ছিল আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন । কিন্তু এই নামের আরো একজন সাহিত্যিক থাকাতে (দৈনিক আজাদ-এর তৎকালীন সম্পাদক) নাম কিছুটা ওলোট-পালট করে রাখেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম।
বাংলাদেশের প্রথম সারির ঔপন্যাসিকদের একজন হলেও ছোট গল্পকার হিসেবেও শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম যথেষ্ট প্রতিভাবান। তিনি সমাজ-সচেতন শিল্পী। তাঁর গল্পে অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের জীবন সংগ্রামের সার্থক বর্ণনা রয়েছে। গ্রামীণ জীবনের শাশ্বত রূপকে তিনি তাঁর রচনায় আঁকতে চেয়েছেন। অবশ্য মানুষের অবক্ষয় ও দুর্দশার চিত্র তিনি সহজে আঁকতে চাননি। তিনি সুস্থ রঙিন জীবনের প্রত্যাশী। এই জন্য দেখা যাবে তাঁর গল্প উপন্যাসে নর-নারীর আবেগ ও আনন্দের একটা চিরকালীন রূপ ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে তার আগ্রহ বেশি এবং এই অর্থে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম রোমান্টিক। তবে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্য-দর্শনে সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী চেতনারও প্রভাব লক্ষনীয়। নিম্নবিত্ত জীবনের বর্ণনায় মানবতাবাদের অনুসারী হলেও তাঁর সৃষ্ট চরিত্র এবং উপন্যাসের সমাজ ভাবনায় মার্কসবাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্মাণে সমাজ অন্বেষাই তাঁকে যোগায় নতুন প্রেরণা। চরম হতাশার মধ্যেও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আশাবাদের ইঙ্গিত। গ্রন্থ প্রকাশের ক্রম হিসেবে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার লেখক। তাঁর 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) এবং 'আলমনগরের উপকথা' (১৯৫৫) উপন্যাস দু'টি বিষয়বস্তু এবং চরিত্র নির্মাণের দিক থেকে সাম্যবাদী জীবন চেতনার পরিচয় বহন করে। ঔপন্যাসিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে সমাজের অপকর্মকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে সমাজকে পাল্টে দেয়ার আহ্বান লক্ষণীয়। লড়াইয়ে তিনি সবসময়ই সমাজের অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষের পক্ষে কলম ধরেছেন।

প্রকাশিত উপন্যাস : আলমনগরের উপকথা (১৯৫৫) এই গ্রন্থটি পরে 'দুই মহল' নামে প্রকাশিত হয়। কাশবনের কন্যা (১৯৫৪), আশিয়ানা (১৯৫৫), কাঞ্চনমালা (১৯৬১), জায়জঙ্গল (১৯৭৮), সমুদ্র বাস (১৯৮৬) ও কাঞ্চনগ্রাম (১৯৮৮) ইত্যাদি।
মৃত্যু : ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

জন্ম : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১ নভেম্বর, শরীয়তপুর জেলার নাড়িয়া থানার ফতেজঙ্গপুর ইউনিয়নের শিরঙ্গল গ্রামে। তার পিতার নাম মোঃ এবাদ উল্লাহ। ১৯৪২ সালে তিনি বিঝারী তারা প্রসন্ন উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে তিনি স্নাতক পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি সিভিল সাপ্লাইয়ের পরিদর্শক পদে চাকরি নেন। ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৭৪-৭৬ সালে তিনি আকিয়াবে (মিয়ানমার) বাংলাদেশের দূতাবাসের ভাইস কনসাল, ১৯৭৬-৭৮ এ ফাস্ট সেক্রেটারী এবং ১৯৭৯-৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের উপপরিচালক হিসেবে খুলনায় কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন।

বাংলা সাহিত্যের অনন্য সাধারণ উপন্যাস 'সূর্য দীঘল বাড়ি'র রচয়িতা আবু ইসহাক, যে ক'জন ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম। সাহিত্য সাধনায় তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদেশের সামাজিক সমস্যা, গ্রামজীবনের ছবি তাঁর উপন্যাস ও গল্পে খুব সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে।

প্রকাশিত উপন্যাস : সূর্য দীঘল বাড়ি (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৭), জাল (১৯৮৮)।

১৯৬০ সালে তিনি উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী পুরুস্কার লাভ করেন।তাঁর 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র ১৯৭৯ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পায়। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৩), সুন্দরবন সাহিত্য পদক (১৯৮১), বাংলাদেশের কথাশিল্পী সংসদ পুরস্কার (১৯৯৭), একুশ পদক (১৯৯৭) লাভ করেন। এছাড়া সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধানের (স্বরবর্ণ অংশ) জন্য 'মানিক মিয়া বৃত্তি' লাভ করেন।

মৃত্যু. তিনি ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)

জন্ম. ৩০ জুন ১৯৪৩, গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম। শিক্ষা ঃ মাধ্যমিক– গাছবাড়িয়া নিত্যানন্দ গোরিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬০); উচ্চ মাধ্যমিক– মাজিরহাট কলেজ, চট্টগ্রাম (১৯৩২); স্নাতক– ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ (১৯৬৭), *স্নাতকোত্তর রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭১), পেশা– লেখালেখি। সম্পাদক–* উত্থানপর্ব।

প্রকাশিত উপন্যাস: সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭), ওঙ্কার (১৯৭৫), একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন (১৯৮৯), মরণ বিলাস (১৯৯০), অলাত চক্র (১৯৯০), গাভি বিত্তান্ত (১৯৯৪), অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (১৯৯৬), পুষ্পবৃক্ষ এবং বিহঙ্গ পুরাণ (১৯৯৬) ইত্যাদি।

মৃত্যু. ২৮ জুলাই, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণী-চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ

উপন্যাসে বিন্যস্ত জীবন নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে বহমান। শ্রেণী বিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজে আর্থ-উৎপাদন কাঠামোর নেতিবাচক রূপ মানুষকে করে দেয় উন্মূলিত, নিরস্তিত্ব। এই নির্মম বাস্তবতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে মানুষ 'শ্রেণীচেতনা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অস্তিত্ববান হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়। 'শ্রেণীচেতনা' বিষয়টি মূলত অস্তিত্বের সংকট মোকবেলা, মানবিক মুক্তি ও নবতর জীবন প্রত্যয় অর্জনের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।

লক্ষ করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী প্রগতি আন্দোলন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ, ১৯৫২ -এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ, নির্যাতন, যুদ্ধ, হত্যা, প্রভৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যে সংকট, অস্থিরতা তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসের মধ্যেই বাঙালি জাতিসত্তার শ্রেণীচেতনার পরিচয় প্রকাশিত।

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত রাষ্ট্র অপেক্ষা পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশের আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ও জন-জীবনের রূপ ছিলো স্বতন্ত্র ধারায় বহমান। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিকাশসূত্রে যে গুণগত পরিবর্তন বিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশে প্রত্যাশিত ছিল, বাঙালি জীবনে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাধাগ্রস্ত। দাঙ্গা, মহামারী, দারিদ্র্য, উদ্বাস্তু সমস্যা, নিপীড়ন, সংস্কৃতি বিলোপের চেষ্টা প্রভৃতি বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে নিক্ষেপ করেছিল এক গভীর সংকটাবর্তে। এ সংকট ছিল মূলত অস্তিত্বের সংকট। তাই রাষ্ট্র ও সমাজিক বিন্যাসের নতুন রূপ ও নবতর জিজ্ঞাসায় বিভাগোত্তর বাংলাদেশের বিষয় উৎসও হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। কারণ সময়, সমাজ ও জীবনের অন্তঃসারকে আত্মস্থ করেই একজন ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেন তাঁর উপন্যসের বিষয়। "চৈতন্যের প্রগতি এবং রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের অধঃগতির দ্বন্দ্ব সংঘাতে সংবেদনশীল শিল্পীকে হতে হয় এক রক্তাক্ত জিজ্ঞাসার সম্মুখীণ। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের বিলম্বিত, মন্থর বিকাশে তখন বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন হয়ে পড়ে ঔপন্যাসিকদের মুখ্য উপকরণ উৎস। যে গ্রাম যুদ্ধ, দাঙ্গা, মহামারী, সামন্তশোষণ, ধর্মশোষণ, স্বাধিকারহীন 'স্বাধীনতা'র নির্মম অভিজ্ঞতায় ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের অগ্নিবলয়ের মুখোমুখি, সেই গ্রামীণ জীবনের সংঘাত ও শ্রেণীচেতনা আশ্রয়ী অস্তিত্ব অভীপ্সাকে তাঁরা উপন্যাসের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন।"[১] আমাদের উপন্যাসে অঙ্কিত গ্রামজীবনের ছিন্নমূল, উন্মূলিত মানুষ শুধুমাত্র জীবনযুদ্ধে বাঁচার তাগিদে নগরে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর সেই সূত্রে তারা শহরের শ্রমজীবী মানুষের ভিড়ে নিজেদের ঠাঁই করে নেয়। উক্ত সংগ্রামী শ্রেণী অস্তিত্বের নগরবাসের ক্লেদ, হতাশা, শোষণ ও জীবনমানের বৈপরীত্যের ছবি তুলে ধরতে যেয়ে বিভাগোত্তর কালের ঔপন্যাসিকরা নব্য পুঁজিপতি, শোষণবাদ ও আধিপত্যবাদী বাণিজ্যিক নাগরিক জীবন ও সভ্যতাকে তাঁদের উপন্যাস শিল্পে রূপায়িত করেছেন। এভাবেই মূলত গ্রামজীবন নির্ভর হয়ে অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গেই বাংলাদেশের উপন্যাসে নগরজীবনের শ্রেণীগত বাস্তবতা ও শ্রেণী-চেতনা রূপায়িত হয়েছে।

শওকত ওসমানের উপন্যাসে বাংলার গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র অভাবগ্রস্ত কৃষিজীবী পরিবার, সরদার জয়েন উদ্‌দীনের কৃষিজীবী পারিবারিক চিত্র এবং তাতে অসহায় নারীর অবস্থান; শহীদুল্লা কায়সারের কৃষিভিত্তিক গ্রামবাংলার ব্যাপক চিত্র ও গ্রামত্যাগী অভাবগ্রস্ত-জীবিকান্বেষী মানুষ, শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও নতুন সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন এবং আবু ইসহাকের

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের নিঃস্ব গ্রামীণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম প্রভৃতি বাংলাদেশের উপন্যাসের সূচনাকালে একটি সমাজ ও শ্রেণীসচেতন ধারা নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)

সময়, সমাজ ও রাজনীতির সুগভীর অঙ্গীকার থেকে সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রেণীশোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বৈপ্লবিক অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের উপন্যাসের বিষয়ভাবনায় তিনি নতুন মাত্রা যোগ করেন।

রুশ বিপ্লবের উত্তরাধিকার ও মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে জাতীয় ও মানব পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং একটি শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে তিরিশ-চল্লিশের দশকের সচেতন ঔপন্যাসিকেরা যে জীবনবোধের কেন্দ্রে লেখনী ধারণ করেন বাংলা উপন্যাসে সে গণচেতনা ও মার্কসীয় জীবনজিজ্ঞাসা বিভাগ পরবর্তীকালে সত্যেন সেনের হাতে এক নিরীক্ষা প্রবণ, নির্দ্বন্দ্ব স্বাতন্ত্র্য মাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়। ধর্ম শোষণ, জাতি শোষণ ও শ্রেণী শোষণের ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত জাতিসত্তার অঙ্গীকার তাঁর উপন্যাসের বিষয় ভাবনায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

বামপন্থী রাজনীতি সচেতন সাহিত্যকর্মী সত্যেন সেনের ১৫টি উপন্যাসের মধ্যে সবগুলোতেই কমবেশি শ্রেণী-চেতনার প্রতিফলন রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল: *উত্তরণ*, *পদচিহ্ন*, *সাত নম্বর ওয়ার্ড*, *মা*, *সেয়ানা*, *অভিশপ্ত নগরী*, *পাপের সন্তান*, *কুমারজীব* ও *বিদ্রোহী কৈবর্ত*।

সত্যেন সেনের 'পদচিহ্ন' (১৩৭৫) উপন্যাস আত্মজৈবনিক ঘটনার প্রতিফলনজাত হলেও একটা বিশেষ কালের সমাজবাস্তবতা ও শ্রেণীচেতনার পরিচয় এতে প্রকাশিত। 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে বিধৃত গ্রাম তিরিশ বা চল্লিশের দশকের গ্রাম নয়, বিভাগোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের আবর্তে ক্ষতবিক্ষত গ্রাম। বাংলা উপন্যাসে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার চিত্রায়ণ বিভাগ-পূর্বকালে রচিত একাধিক উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। কিন্তু বিভাগোত্তর কালের পাকিস্তানশাসিত বাংলাদেশে এই সমস্যার স্বরূপ ছিল স্বতন্ত্র। সত্যেন সেনের নির্মোহ সমাজ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণী সংকট এ-উপন্যাসে যথার্থ স্বরূপ নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবনের বহির্গত রূপ-বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অন্তর্জীবনে যে পরিবর্তন ও সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে, 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে লেখক তার রূপায়ণে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছেন বলা চলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষারত দুই বন্ধু সুবিনয় ও আনিস। এঁদের বন্ধুত্ব কেবল মানবিক সম্পর্ক সূত্রেই নয়, প্রগতিশীল জীবনবোধ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের অভিন্নতায় সে বন্ধুত্ব গভীর ও মেধানিয়ন্ত্রিত। অবশ্য লেখক সুস্পষ্টভাবে এই আদর্শবোধের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলেও, উপন্যাসে বিধৃত এঁদের আচরণ ও কর্মধারা থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়। কাহিনী অনুসারে নাগরিক জীবনে লালিত-বর্ধিত আনিস সুবিনয়ের গ্রামের বাড়ি যেতে ইচ্ছুক। তার এই আকাঙ্ক্ষার কারণ বৃহত্তর গ্রামজীবনকে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করা। সুবিনয়ের নিজ গ্রাম শ্রীপুর ও তার পরিপার্শ্ব এ-উপন্যাসের পটভূমি।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী জামালপুরের হাট, তার জনস্রোত; ঘাসির পুকুরপার গ্রাম ও তার অন্তর্বর্তী বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে 'পদচিহ্ন' উপন্যাসের কাহিনী সুবিস্তৃত ও অধিকতর সমাজ-বাস্তবতাসংলগ্ন হয়েছে। শ্রীপুর যেমন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের সঙ্কট ও অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি, তেমনি জামালপুর বা ঘাসির পুকুরপার নব্যপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত মুসলিম জনশ্রেণীর সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাকে ধারণ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিচিত্রমাত্রিক স্বরূপ সাত্তার-কাশেম প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। সাত্তার যেমন আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনাসমৃদ্ধ প্রগতিশীল মুসলিম তারুণ্যের প্রতীক, তেমনি কাশেম নবগঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নেতিবাচক প্রবণতাজাত অস্বাভাবিক ও বিকৃতভাবে বেড়ে-ওঠা সঙ্কীর্ণচিত্ত সুবিধাভোগী মুসলিম জনশ্রেণীর প্রতিনিধি। লেখক উপন্যাসে সমান্তরালভাবে দুটি শ্রেণীমানসকে বিন্যস্ত করেছেন।

মরণ কৈবর্তদাসের মাধ্যমে অন্ত্যজশ্রেণীর হিন্দুর জীবনসমগ্রতা হয়ে উঠেছে প্রত্যক্ষগোচর। একদিকে সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যলালিত সংস্কার, অন্যদিকে অধীত জ্ঞান ও মানব প্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্তি -দুটোর প্রভাবই ব্যক্তিমানুষের জীবনে অনিবার্য। মরণ কৈবর্তদাস যখন পাকিস্তান, মুসলমান প্রভৃতি প্রসঙ্গে মনোভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করে চলেছে, তখনই সুবিনয়ের প্রগতিশীল মানসগড়নের গভীরতর উৎস থেকে হিন্দুসংস্কার আকস্মিকভাবে হলেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। চরিত্রনিহিত এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ উদঘাটনে সত্যেন সেন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন:

> "নিজের দেশ! মরণ ঠোঁঠ উলটে বলল, কি যে আপনি বলেন, আমি এর মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। সমস্ত মানুষ এক কথা বলে, আর আপনার মুখে ঠিক তার উলটো কথা। এদেশ কি এখনো আমাদের আছে? সে যখন ছিল, তখন ছিল।
> চমকে উঠল সুবিনয়। যেই কথাটা সে এড়াতে চাইছিল, সেইটাই আবার কেমন করে ফিরে ফিরে আসছে। তার মনে মনে আফসোস হচ্ছিল, কেন সে প্রথমেই আনিসের পরিচয় দিয়ে দেয়নি।"[২]

সুবিনয়ের এই মানসিকতা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি আনিসের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া অন্যতর মনোভাবের জন্ম দিতে বাধ্য। আনিস-সুবিনয়ের কথোপকথনে এ-সত্যটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুবিনয়ের চরিত্রের অভ্যন্তরস্থ দ্বন্দ্বকে অসঙ্গত মনে হয় না। উভয়ের কথোপকথনে যে স্বরূপ সত্য প্রকাশ পেয়েছে তা সমসাময়িক জীবনে শ্রেণীগত বাস্তবতার পরিচয় দেয়। ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যই যেন অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন নিম্নোক্ত এই অংশটি -

> "মরণ চলে গেল। রইল বাকি আনিস আর সুবিনয়। মরণের সঙ্গে দেখা হবার আগ পর্যন্ত শ্রীপুরের ইতিকথা নিয়ে দুজনে মুখর হয়ে উঠেছিল। এই নির্জন রিক্ত গ্রামের বুকে কত কথাই যে লুকিয়ে আছে সুবিনয় নিজেও অতটা ভেবে দেখে নি। বোবা শ্রীপুর যেন তারই কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে তার হারিয়ে যাওয়া কাহিনীগুলো প্রকাশ করে চলেছিল। হঠাৎ এর মাঝখানে মরণ এসে কি এক ঘূর্ণি জাগিয়ে তুলল। বদলে গেল আবহাওয়াটা, বদলে গেল মানুষ দুটি। ওরা দু'জন কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ হয়ে রইল।
>
> হঠাৎ হেসে উঠল আনিস। সুবিনয় স্বপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল-
> তোমার সঙ্গে গ্রাম দেখতে এসেছিলাম সুবিনয়। গ্রাম মানে প্রাকৃতিক গ্রাম নয় তার চেয়েও বেশি গ্রামের মানুষ। আমি শহরের ছেলে, আমি আমার স্বদেশের অন্তরাত্মার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছিলাম। আমার স্বদেশের প্রাণ গ্রামের মধ্যে, শহরে নয়, একথা অনেকবার তুমি আমায় বলেছ। এ কথা আমিও বুঝি। আর যেই মাত্র গ্রামের বুকে এসে পড়েছি, সে কথা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে দেখাতে নিয়ে এসে, এখন সেই তুমিও আমার চোখের

Dhaka University Institutional Repository

সামনে এমন করে পর্দা টেনে দিতে চাইছ কেন? যা সত্য, কেন তুমি তাকে আড়াল করে রাখতে চাইছ?
তার মানে? এসব বলছ কি তুমি? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল সুবিনয়। ঠিকই বলছি। মরণদাকে তুমি তার মনের কথাগুলি প্রকাশ করতে দিলে না। যেই মাত্র তার চাপা দেওয়া কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল, অমনি কি এক ভয়ত্রস্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠলে তুমি!"[৩]

সুবিনয়ের অন্তরালে যে অবশিষ্ট 'হিন্দুমন' প্রচ্ছন্ন হয়েছিল, আনিসের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তার সারসত্যকেই কেবল তুলে ধরলেন না লেখক, শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটা সমাধানপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গিকেও উপস্থাপন করলেন।

সুবিনয়ের বোন আরতির যে সঙ্কট তা ঠিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সামাজিক শ্রেণীগত সঙ্কটেরই একটি গভীরতর রক্তক্ষত স্তর। তার শিক্ষা-দীক্ষা-অভিরুচির সঙ্গে বর্তমান পারিপার্শ্বিকতার অসামঞ্জস্য এই রক্তক্ষরণকে করেছে তীব্রতর। আরতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের নারীর শ্রেণীগত অবস্থান ও চেতনাগত পরিচয়ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।
ঘাসির পুকুরপার গ্রামের জীবন বিন্যাস শ্রীপুর থেকে স্বতন্ত্র। মুসলমান অধ্যুষিত এই গ্রামের বহির্বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতা অঙ্কনে লেখকের অভিজ্ঞতার বিস্তার ও সূক্ষ্মতা গভীরতাস্পর্শী। দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সমান্তরাল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সত্যেন সেনের অনাসক্ত নির্মোহ জীবনদৃষ্টি বিস্ময়কর। স্বদেশবিতাড়িত পশ্চিম বঙ্গীয় মুসলমান খুরশেদ আলমের মধ্য দিয়ে সমাজ-ইতিহাসের আরেকটি রক্তক্ষত দীর্ঘশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনের সীমাহীন সঙ্কট ও ভাঙা-গড়ার ইতিবৃত্তের সঙ্গে সমান্ত রালভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আশ্রয়দাতা নির্মল রায় ও তার পারিবারিক পরিচিতি। একটা অসঙ্গত রাজনৈতিক বিভাজনের মর্মন্তুদ প্রতিক্রিয়া কীভাবে মানুষকে স্ব-ভূমি ও আশৈশব লালিত প্রকৃতিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, খুরশেদ আলম এবং রায় বাবুদের জীবনকথায় তাই অভিব্যক্ত হয়েছে। নিজের স্মৃতিছিন্ন অতীত জীবন স্মৃতিবিজড়িত রায়বাড়ির সমগ্রতা সমাজ-বাস্তবতার এক বেদনাঘন অধ্যায়। বহু পুরুষের শ্রম ও সাধনায় নির্মিত ঐতিহ্যময় পারিবারিক জীবন কীভাবে একটা অসঙ্গত রাজনৈতিক মীমাংসার ফলে অবক্ষয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে, খুরশেদ আলম বা রায় বাবুদের বিপর্যস্ত সংসারের মধ্য দিয়ে সে সত্যকেই উন্মোচন করেছেন লেখক। খুরশেদ আলমের বর্ণনায় সেই গার্হস্থ্য জীবনসত্য ও সেই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মর্মন্তুদ চিত্র প্রতিবিম্বিত। কলকাতার দাঙ্গা, বিভাগোত্তর কালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, স্বদেশত্যাগী মানুষের বিপন্ন অর্থনৈতিক-পারিবারিক জীবন প্রভৃতি প্রসঙ্গ খুরশেদ আলমের জীবনকথায় একটি সময়কালের জীবনচিত্র শ্রেণীসচেতন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন লেখক।

সমাজদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বপীড়িত জনজীবনের মধ্য থেকে যারা নতুন সম্ভাবনার লক্ষ্যে উজ্জীবিত, সেই বিকাশমান শ্রেণীর প্রতিনিধি আনিস, সুবিনয়, সাত্তার। হিন্দু বা মুসলমান নয়- একটা স্বতন্ত্র পরিচয়ে তারা উজ্জ্বল। সেই দ্বন্দ্বময় অথচ দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনায় জাগ্রত শ্রেণীচরিত্রের স্বরূপ আনিসের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে:

"-----আসল কথা কি জান, সুবিনয় হিন্দু আর আমি মুসলমান হলেও আমরা দু'জন অপর জাতের অন্তর্ভুক্ত। সেই জাতের নাম নিম্নমধ্যবিত্ত।
-----সাত্তার সকৌতুকে প্রশ্ন করল আর আমি? আমাকে কোন জাতের মধ্যে ফেলেছেন?
ফেলবার মালিক কি আর আমি? আনিস উত্তর দিল, পরিবেশ আর বৃত্তি ঠেলে নিয়ে চলেছে এ-জাত থেকে ও জাতে এ পংক্তি থেকে ও পংক্তিতে। তুমিও নিম্ন মধ্যবিত্তের দিকে পা বাড়িয়েছ।

Dhaka University Institutional Repository

> কিন্তু এখনো তোমার গায়ে মুসলমান কৃষকের গন্ধ লেগে রয়েছে। ---এই যে, আমি, সুবিনয় এবং আমাদের মত কেউ কেউ, এরা হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রগতিশীল নামক অংশ। আমরা আমাদের উপরতলার লোকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করি। আর আমাদের নিচে যারা আছে তাদের সাথে একাত্মতা অনুভব করতে চাই। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এই একাত্মতার জন্ম মস্তিষ্কে, তার শিকড় হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।"[৪]

এই বিশ্লেষণ যে লেখকের সমাজ-অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান-উৎসারিত, তা বলাই বাহুল্য। সুবিনয়ের আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্যেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিবাচক স্বরূপসত্য বিধৃত।

মদন ঢালী ও তার পারিপার্শ্বিক জীবন বর্ণনায় লেখক সমাজের অন্যতর স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। যেখানে মানুষ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়াও অন্য একটি শ্রেণীর অন্তর্গত যা কেবলই নির্ধারিত হয় অর্থনৈতিক অবস্থানের দ্বারা। রফিকের মধ্য দিয়ে গ্রামজীবনের প্রতি যে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে-তা মূলত স্ব-সমাজের অস্বাভাবিক ও স্ফীতোদর সুবিধাভোগী শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই। যাদের শ্রেণীচরিত্র ঠিক সাম্প্রদায়িকতার পর্যায়ভুক্ত নয়, তার চেয়েও মারাত্মক।

> "ওয়াহেদ মল্লিক এতদিন হিন্দুদের সম্পত্তি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করেছে আর আমাদের মুসলমান ভাইদের কেউ কেউ তার দালালি করেছে। --------কিন্তু ওয়াহেদ মোল্লা এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। হিন্দু আর মুসলমান খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই তার। হিন্দু ভাইদের সম্পর্কে যা করণীয় তা শেষ করে এখন মুসলমান ভাইদের পেছনে লেগেছে।"[৫]

রফিকের উক্তিতে কৌতুকের মধ্য দিয়ে হলেও এখানে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এভাবেই 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে বিভাগোত্তর একটি বিশেষ সময়কালের বাংলাদেশের শ্রেণী অস্তিত্ব, আত্মিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-চেতনার পরিচয় আনিসের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, শ্রুতকাহিনীমালা-যামিনী মিত্র, সুবিনয়, আরবালি হাওলাদার, কুদ্দুস মিঞা, খুরশেদ আলম বর্ণিত অতীত-বর্তমান এবং সর্বোপরি লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টির অনাসক্ত প্রয়োগে বিন্যস্ত হয়েছে। 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে স্পষ্ট করে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত না হলেও উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র আনিস ও সুবিনয় দেশের অর্থনৈতিক অসাম্য ঘোচানোর জন্য শ্রেণীসচেতন দৃষ্টিকোণে সমাজতন্ত্রের পথকেই হিন্দু মুসলমান সকলের জীবনের সার্বিক মুক্তির পথ হিসেবে দেখতে পেয়েছে।

বলা যায়, 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে প্রগতিশীল চেতনার আলোকে বিন্যস্ত জীবন লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টির অনাসক্ত প্রয়োগে এভাবেই শ্রেণী-চেতনার পরিচয় সমগ্রতা লাভ করেছে।

'পদচিহ্ন'-এর পরে সেয়ানা (১৩৭৫), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৯৬৯), উত্তরণ (১৯৭০), মা (১৯৭০), একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে (১৯৭১) উপন্যাসগুলো উল্লেখযোগ্য। উক্ত উপন্যাসগুলোতে কারাগার থেকে শুরু করে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জীবন সমগ্রতা এমনকি, নীতি আইনের মানদণ্ডে অবজ্ঞাত ঘৃণিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড পর্যন্ত যে সমাজবাস্তবতার অনিবার্য সত্য সেই সমাজকেই সত্যেন সেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অবলোকন করেছেন। সামাজিক উত্থান পতনের মধ্যে ব্যক্তিক ও সামূহিক অস্তিত্বের যে সঙ্কট, সেই সঙ্কট এবং তা থেকে উত্তরণের মানবীয় সাধনা তথা শ্রেণী-চেতনার পরিচয় এসব উপন্যাসে সুস্পষ্ট। রাজনীতি ছিল সত্যেন সেনের জীবন ও শিল্পবোধের কেন্দ্রীয় প্রেরণা। সত্যেন সেনের পনেরটি উপন্যাসের মধ্যে তিনটি উপন্যাসের মুখ্য উপাদান রাজনীতি। উপন্যাস তিনটি হচ্ছে– ১. উত্তরণ, ২. সাত নম্বর ওয়ার্ড, ৩.

Dhaka University Institutional Repository

'মা'। এই তিনটি উপন্যাসেই শ্রেণী-চেতনা প্রাসঙ্গিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'রাজনৈতিক কর্মীসত্তার দায়িত্বজ্ঞান থেকে সাহিত্য সাধনাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার ফলেই সত্যেন সেনের উপন্যাসে জীবন ও রাজনীতি তুল্যমূল্য হিসেবে প্রতিবিম্বিত।'[৬] বিভাগ পরবর্তী গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিন্যস্ত ষাটের দশকের সামরিক শাসন কবলিত বাংলাদেশের জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারহীনতা যে মানবিক বিকাশের বহুবর্ণিল প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, শ্রেণী সচেতন দৃষ্টিতে তা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। এ কারণে সত্যেন সেনের রাজনীতি আশ্রয়ী উপন্যাসসমূহে প্রসঙ্গতই শ্রেণী-চেতনার উজ্জ্বল উপস্থিতি বিদ্যমান।

সত্যেন সেনের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'উত্তরণ'(১৯৭০) -এ মধ্যবিত্তের চেয়ে শ্রমিক-কৃষক চরিত্রের জীবনসংগ্রাম তথা শ্রেণীসংগ্রাম প্রাধান্য পেয়েছে। আর এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে চরিত্রের সবাই শ্রেণীত্যাগী হয়ে স্বদেশবাসী শ্রমজীবী মানুষের তথা মানবমুক্তির লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়নি সত্য, তবু তারাও প্রায় সবাই শ্রেণীসংগ্রামের কর্মীদেরকে উৎসাহিত করেছে। সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়াতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। 'উত্তরণ' উপন্যাসের রহমান, ফয়েজ, হারুন ও মাসুদ প্রমুখ শ্রেণীত্যাগী মধ্যবিত্ত তারই দৃষ্টান্ত।

'উত্তরণ'-এর পটভূমি দেশ বিভাগের আগের কলকাতা ও ঢাকার নাগরিক পরিবেশ। দু'টি দেশের ব্যবসায় শিল্পাঞ্চল এবং গ্রামীণ বাস্তব প্রতিবেশ স্থান পেয়েছে। বিত্তবান, মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীনদের শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের সত্যও এতে পরিস্ফুট। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ বেশি গুরুত্ব না পেলেও দেখতে পাই, আলোচ্য উপন্যাসে শ্রমিক মজুরদের রাজনীতিতে সক্রিয় কর্মীদের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠায় লেখক সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাই এ উপন্যাসে সম্প্রদায় নারী-পুরুষ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমাগত নায়ক মালেক, নায়িকা জুলেখা, রহমান, ফয়েজ, হারুন, ইয়াসীন, লতিফ, মাসুদ, দিল মোহাম্মদ, ফজলু মিয়া, ফরিদা, মনোজ আতর্থী, সিদ্দিক প্রমুখ সংগ্রামী পতাকা হাতে সম্মিলিত সংগ্রামে অবতীর্ণ। এদের বিরুদ্ধ পক্ষে অবস্থান নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট কারখানা মালিক ছাড়াও ম্যানেজার গগন চৌধুরী, কন্ট্রাক্টর সুরুজ মিঞা, কদম সারেং এবং তাদেরই সহযোগী ডাঃ নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

তাই শ্রেণীসংগ্রাম যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এ উপন্যাসে। বন্ধন মুক্তির বিপ্লবী সংগ্রামে জুলেখা-ফরিদার মতো পোড় খাওয়া নারীরাও পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সমান শক্তি না হলেও সমান সাহস নিয়ে। এমনি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণে 'উত্তরণ' উপন্যাস বিশিষ্ট।

এ গ্রন্থে শ্রেণীচেতনা বিষয়টি আমাদের বিস্তৃতকালের জীবনধারার সামগ্রিক সত্যরূপে নিম্নবিত্ত যুবক মালেকের জীবনসংগ্রামের সূত্রে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বাঙালির জাতীয় জীবনে রাজনীতির সূত্রপাত কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, সমাজ বিকাশ ও তার আধুনিক শিল্পায়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভবের প্রসঙ্গ জড়িত। এই সচেতনবোধ থেকে সত্যেন সেন 'উত্তরণ' উপন্যাসে রহমান চরিত্রের অবতারণা করেছেন। নিম্নবিত্ত কৃষকের সন্তান রহমান কিভাবে কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন ও জীবিকার আকর্ষণে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে এবং শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নিজ জীবনধারার সঙ্গে অভিন্ন করে ফেলেছে, তার পরিচয় আমরা দেখি।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহাজের কর্মচারী মালেকের মানস বিকাশে ও আত্ম-আবিষ্কারের পথ-পরিক্রমায় এই রহমান চরিত্রটির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মালেকের অন্তর্লোকে সমষ্টি চেতনার সূত্রপাত ঘটে শ্রেণী সচেতন রহমানের অনুভবলব্ধ উচ্চারণ থেকে ঃ "আমি তো মনে করি,

Dhaka University Institutional Repository

আপনিও আমাদের এই হতভাগাদের মতোই একজন। কিন্তু তবু আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে, এখানে যারা আমাদের দিন-রাত্রির সুখ-দুঃখের সাক্ষী, তাদের কারু সম্পর্কে কোনদিন কোন খোঁজ নিয়েছেন? কে কেমন আছে, কার দিন কিভাবে চলছে? এই কথাটুকু জানতে চেয়েছেন কোনদিন।"[৭]

তখন থেকেই অধিকার বিড়ম্বিত জাহাজী শ্রমিকদের কর্মধারা ও জীবন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সারেং সাহেবের ভাগ্নে মালেক গভীর আত্মদ্বন্দ্বে নিক্ষিপ্ত হয়। তার দ্বন্দ্ব ও আত্মানুসন্ধান ব্যক্তিক স্তরকে অতিক্রম করে শ্রমজীবী মানুষের সামগ্রিক অনুভবে পরিণতি লাভ করে। সেভাবে, যদি সে ব্যক্তিস্বার্থকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করে, তাহলে হয়ত শ্রেণী অবস্থানের রূপান্তর সাধন করে একসময় সে খালাসিতে উত্তীর্ণ হয়ে শোষকের পদে অধিষ্ঠিত হবে। মালেকের এমনি রকম উপলব্ধির মধ্যে একদিন দেখা যায় শ্রমিকদের অধিকারবোধ এবং প্রতিবাদের শাস্তিস্বরূপ রহমান ও আলমের আকস্মিক চাকরিচ্যুতি ঘটে। রহমান ও আলমের আকস্মিক চাকরিচ্যুতি ও জোরপূর্বক নির্জন চরে তাদের নামিয়ে দেয়ার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে মালেক জাহাজের চাকরি ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। মালেকের এ আত্মসমীক্ষা উত্তরণমুখী শ্রেণীচেতনার পরিচয় বহন করে–

> "... লোকে বলে মানুষ অবস্থার দাস, কি জানি, দেখতে দেখতে এ সমস্ত হয়ত একদিন আমার গা সওয়া হয়ে যাবে। তারপর আমাদের আর একজন টালি-সুকানী জলিল সাহেবের মত আমিও এই মাল চুরির কাজে শরীক হয়ে যাব। মামা ভরসা দিয়েছে, বছর কয়েক বাদেই আমাকে কোন একটা ফ্লাটের সাড়েং বানিয়ে দেবে। অসম্ভব নয়, উপরওয়ালের কাছে মামার সুপারিশের জোর আছে। তখন আমিও মামার মতই গরিব খালাসীদের রক্ত শুষে মোটা হয়ে চলব।"[৮]

মায়ের উদ্দেশে উচ্চারিত মালেকের এই উক্তিতে তার শ্রেণীসচেতন দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় প্রতিফলিত।উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে মালেকের দীর্ঘায়িত, জটিল এবং কঠোর সংগ্রামময় জীবনের স্বরূপ রূপায়িত হয়েছে। জাহাজের চাকরি ছাড়ার পর কলকাতায় কৃষ্ণা কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এ মালেকের চাকরি প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সূচিত হয় তার জীবনের নতুন অধ্যায়। ঠিক শ্রমিক হিসেবে নয়, শ'খানেক শ্রমিকের সুপারভাইজার হিসেবে। কিন্তু মালেকের এই চাকরি জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদ-বুদ্ধিতাড়িত শাসন-শোষণের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর ভারত বিভক্তির ফলে দাঙ্গা, পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলমান হিসেবে মালেকের দ্বন্দ্ব জীর্ণ পাকিস্তান সমর্থন প্রভৃতির উন্মোচন প্রসঙ্গে সত্যেন সেন সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার একটা সামগ্রিক চিত্র অংকন করেছেন। এরই বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা যেমন–

> "দাঙ্গা থেমে গেছে সত্য, কিন্তু মানুষের মনে বিদ্বেষের আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কলুসিত ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এখানে এখন মানুষ বলে কোন প্রাণী নেই, আছে একদল হিন্দু আর একদল মুসলমান। ধর্মের পায়ে, সাম্প্রদায়িকতার পায়ে এরা মানুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়েছে। কাজে এবং চিন্তায় কে কতদূর বর্বর হতে পারে, দু'দলের মধ্যে তাই নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা।"[৯]

যে দাঙ্গা সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছে, তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় কৃষ্ণা কেমিক্যাল ওয়ার্কস থেকে মালেকের চাকরি চলে যায়।

> "চলে এল মালেক। তার সহকর্মী হিন্দু ভাইরা উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেউ কোন কথা বলল না। সে যে মুসলমান, মালেক তার জীবনে এ কথাটা আর কখনো এমন প্রবলভাবে অনুভব করেনি। আবার পথে ভাসল মালেক।"...[১০]

এরপর নারায়ণগঞ্জ জুট কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণের মধ্যদিয়ে সূচিত হয় মালেকের জীবনের পরিবর্তিত নতুন অধ্যায়, উপন্যাসের তৃতীয় পর্ব। পাট কোম্পানির চাকরির অভিজ্ঞতা সূত্রে মালেক বুঝতে সক্ষম হয় শোষক ও শোষিতের সত্যিকার ব্যবধান সীমাকে। বুর্জোয়া শোষনের মুনাফাকেন্দ্রিক প্রশাসন প্রক্রিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

চারিত্র রূপ। সে বুঝতে পারে, হিন্দু অথবা মুসলমান অপেক্ষা মানুষের শ্রেণী অবস্থানই যে সবচেয়ে বড় কথা, এই মীমাংসিত সত্য শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে উপলব্ধি করে মালেক। শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মালেকের আত্ম-উন্মোচনের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ; যেমন–

> "আনন্দ আনন্দ– এত আনন্দ মালেক তার জীবনে আর কখনো পায়নি। একটা প্রচণ্ড আঘাতের মধ্য দিয়ে বাইরের বাধা ভেতরের বাধা সবকিছুই অপসারিত হয়ে গেছে। এতদিনের সংকীর্ণ পরিবেশের বেষ্টনী ভেঙ্গে বিপুল জনতার মাঝখানে এসে পড়েছে। এর মধ্যেই তার মুক্তি। সকল আনন্দের বড় আনন্দ, সে আজ সেই আনন্দের স্বাদ পেয়েছে।
>
> -------- এরই মধ্যে এরই পাশাপাশি আর এক স্বপ্ন পেয়ে বসল তাকে। মৃত্যুর বুকে নবজন্মের মতো অন্ধকারের বুকে আলোক শিখার মতো ওই স্বপ্নের মধ্যে এক অনাগত নতুন দিনের আগমনী। রহমান ভাইয়ের চোখে, হারুনদের চোখে, এই স্বপ্নের ছায়া দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল।"[১১]

এভাবেই শ্রেণীশোষণমুক্ত মানবমুক্তির অন্বেষণ ও প্রত্যাশার রূপাঙ্কনে প্রকৃত অর্থেই 'উত্তরণ' উপন্যাস শ্রেণীচেতনার প্রোজ্জ্বল পরিচয়ে সফল একটি উপন্যাস হতে পেরেছে।

এরপর রাজনৈতিক উপন্যাস সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) শ্রেণীশোষণ মুক্তির গণ-বৈপ্লবিক চেতনা এ উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। আপাতদৃষ্টিতে 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' ব্যাপক কোন রাজনৈতিক আলোড়নের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস নয়। কিন্তু শ্রেণীচেতনার অংশ হিসেবে যে গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনা রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এ উপন্যাসের ঘটনাপুঞ্জের মূলে তাই ক্রিয়াশীল।

দিনাজপুরের পল্লীগ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সরলমনা এক সেবিকার ট্র্যাজেডি অংকনে, নারী শ্রমের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার স্বরূপকে বামপন্থী রাজনীতিক সত্যেন সেন শ্রেণীসচেতন দৃষ্টিতে গভীর মমতা নিয়ে রূপায়িত করেছেন। আর সেই বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাসকে এক সময়ে শক্তিতে পরিণত করে সংঘবদ্ধ আন্দোলনে রূপ দিয়েছেন। অত্যাচার, অনাচার, বঞ্চনা এবং শ্রমশোষণের প্রতিবাদে হাসপাতালের নার্সরা সংঘবদ্ধ হয়। কিছুসংখ্যক যুক্তিসঙ্গত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তারা ধর্মঘট করার প্রস্তুতি নেয়। এই শ্রেণীসংগ্রামের ফলে আন্দোলন একটি সর্বজনীন রূপ নিলে সন্ত্রস্ত কর্তৃপক্ষ নার্সদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু নার্সদের দাবি স্বীকৃতি অর্জন করলেও কর্তৃপক্ষের আক্রোশ অসঙ্গতভাবে নিপতিত হয় ওয়ার্ডের চিকিৎসারত কলেজ ছাত্র রোগী আকমলের উপর। মারাত্মক রোগী হওয়া সত্ত্বেও তাকে Discharge করা হয়। নার্সদের জয়লাভের মূল্য দিতে হয় সচেতন সংবেদনশীল রোগী আকমলকে। এভাবেই লেখক 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' উপন্যাসে মূলত ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর অন্তর্গত প্রশাসনিক অব্যবস্থাকে শ্রেণীসচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

সত্যেন সেন রচিত 'সেয়ানা' (ঢাকা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ) শীর্ষক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঝড়ুও দশ বছর বয়সে মিঠুয়া নামক এক চালিয়াত পকেটমারের প্ররোচনায় সেয়ানা জীবনে হাতেখড়ি নেয়। তারপর থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত একটানা অন্ধকার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থেকে ঝড়ু বিচিত্র ও তিক্ত জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং শেষে এ ঘৃণ্যবৃত্তি ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়।

রংপুর জেলার এক অখ্যাত গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়া ঝড়ু সেয়ানা-জীবনের পথে কলকাতা, কাটিহার, আসাম প্রভৃতি শহরাঞ্চলের এবং পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পাকিস্তান আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত-বিত্তবানের নানা অসঙ্গতিতে ভরা জীবন-স্বরূপ, সাফল্য-ব্যর্থতা সকল অভিজ্ঞতাই সঞ্চয়

Dhaka University Institutional Repository

করে। আসামে ইংরেজ সৈন্যদেরকে নারী-যোগানদারের কাজ করার সময় এবং আগে-পরে পতিতাসহ বিচিত্র-স্বভাবের নারীর সংস্পর্শে আসে ঝড়ু; অথচ বিয়ে করে লুসী নামের এক খ্রিস্টান মেয়েকে, ভালবাসে এক মারাঠী-কন্যাকে। স্ত্রীর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে ঝড়ুর স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সংকল্প সাময়িকভাবে বানচাল হয়। সে পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের বিচিত্র করুণ বাস্তবতা অবলোকন করে আবেগাপ্লুত হয়। ওস্তাদ মিঠুয়ার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সখিনার বাধ্য হয়ে দেহ ব্যবসায় নামার ঘটনা ঝড়ুর জীবনধারার মোড় ফেরায়। সৎ জীবনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেবার পর ঝড়ু দেখে ঃ

> "এতদিন মনে হয়েছিল, এই সেয়ানা জীবনের মধ্যে অবাধ মুক্তির সন্ধান পেয়েছে সে। আর আজ মনে হচ্ছে, এ যেন একটা জটিল ফাঁদ। ইঁদুরের কলের মতো এর মধ্যে ঢুকবার পথ আছে, কিন্তু বেরুবার পথ নেই।"[১২]

সত্যেন সেন এর 'সেয়ানা' উপন্যাসে ঝড়ুর সেয়ানা জীবন পরিত্যাগের ব্যাপারটা তার শ্রেণী সচেতনতারই ফল। সে শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ না হলেও তার ইঙ্গিত তুলে ধরে।

'মা'(১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) সত্যেন সেনের রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম। এ উপন্যাসটিতে প্রাসঙ্গিকভাবেই শ্রেণীচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শকেন্দ্রিক নতুন রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টির ইতিবৃত্ত রচনার অনুষঙ্গে সত্যেন সেন এ উপন্যাসে কংগ্রেসী রাজনীতির ইতিহাস পরম্পরা, সমাজপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আদর্শ ও লক্ষ্যের পশ্চাৎপদতা, অন্তঃসারশূন্যতা, বিকৃতি প্রভৃতিকে রূপায়িত করেছেন।

কংগ্রেসের সংকীর্ণ নির্দেশে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রবাল কেবল বিভু ও বীথির কাছ থেকেই নয়, মায়ের বাড়ি থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে তার রাজনৈতিক কর্মধারাও গতি এবং বিস্তৃতি পায়। আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শক্তি শ্রমিকদের মধ্যেই সে নিজের আবাস রচনা করে। তার সাংগঠনিক তৎপরতায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদের অনুসারীদের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'সন্ত্রাসবাদের ফাঁদ' থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসে যুগোপযোগী রাজনৈতিক মতাদর্শের জীবনময় ও প্রাণপ্রদীপ্ত আকর্ষণে। কেশরাম কটন মিলকে কেন্দ্র করে প্রবালের রাজনৈতিক সংঘশক্তি পূর্ণতর রূপ লাভ করে। মিলের শ্রমিকদের ওপর সামন্ত পদ্ধতিতে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সে তিন মাসের মধ্যে শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত করে তোলে। ফলে একদিকে যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য রূপ ধারণ করে, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিকদের ঐক্যও হয় সুদৃঢ়। প্রবালের প্রত্যাশিত শ্রেণীসংগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথ এভাবেই প্রশস্ততর হতে থাকে।

উপন্যাসের অন্য চরিত্র সিবেন রায়ের উক্তির মধ্য দিয়ে লেখকের মীমাংসিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানেরই যেন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–

> "হ্যা, আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে গেছে।... আদর্শ হিসেবে সন্ত্রাসবাদের দিন গত হয়ে গেছে। যারা এতদিন এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিল, তাদের আজ নতুন করে পথ নির্বাচন করতে হবে।"[১৩]

সেই নতুন পথ, প্রবালের সহযোগী মোবারক-উচ্চারিত শ্রেণীসংগ্রামের পথ। এই শ্রেণীসংগ্রাম যে অনিবার্য, তার কারণও শ্রমিক-আন্দোলন রোধের প্রশ্নে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের ঐক্য থেকেই প্রমাণিত হয়। শোষণ-বঞ্চনা ও নিপীড়নের পথ প্রশস্ত করে, সমাজ প্রগতিকে অবরুদ্ধ করার প্রশ্নে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের মধ্যে শ্রেণীচরিত্রগত ঐক্য ঔপনিবেশিক শাসনের শিক্ষা ও পরিচর্যারই অবদান। কিন্তু মুষ্টিমেয় শোষকের ঐক্য প্রবাল ও তার সহযোগীদের রক্তাক্ত করেও ব্যাপক আন্দোলনের গতিকে প্রতিহত করতে পারেনি, তা প্রকারান্তরে সংঘশক্তি থেকে জনশক্তিতে, জনশক্তি থেকে মিছিলে রূপান্তরিত হয়েছে। এভাবেই 'মা' উপন্যাসের তীব্র শ্রেণীচেতনা শ্রেণীসংগ্রামে উপনীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের উপন্যাসে স্বাভাবিকভাবে শ্রেণীচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমরা লক্ষ করি। সত্যেন সেনের কয়েকটি মিথ ও ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসেও সমকালীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভাবধারার রূপায়ণে শ্রেণী বা সংঘচেতনার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৮), পাপের সন্তান (১৯৬৯), বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পুরুষমেধ (১৯৬৯) উল্লেখযোগ্য।

বাইবেলিক মিথ-কথাকে ঔপন্যাসিক সমকালীন চেতনা শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করেন 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৮) ও 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯) উপন্যাসে। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের 'যেরেমিয়া' অধ্যায় থেকে তাঁর 'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের কাহিনী নেয়া হয়েছে। 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসে জেরুজালেমের পতন দেখান হয়েছে।

'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের নায়ককল্প পুরুষ যেরেমিয়া সমষ্টি অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষার রূপকার। তার মধ্য দিয়েই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন ও দাসত্বের বিরুদ্ধে মানবীয় ধর্ম। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় যেরেমিয়ার মত অসংখ্য প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত পুরুষের উপস্থিতি দেখা যায়, যারা নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় সমগ্র জনগোষ্ঠীর নায়ক পুরুষে পরিণত হয়েছেন। ...যেরেমিয়ার মধ্যে ঔপন্যাসিক মিথিক শক্তির ইতিবাচক তাৎপর্যকেই সন্ধান করেছেন। নবী যেরেমিয়া ছাড়াও এ উপন্যাসে অহিকম, জিল্লা, গেদালিয়া, নবী হানানিয়া, ক্রীতদাস, ইউসুফ প্রভৃতি শ্রেণীচরিত্র চমৎকারভাবে অংকিত হয়েছে।

অহিকম জেরুজালেমের ঘটনার স্রোতে জড়িয়ে যায় যেমন, তেমনি তার পুত্র গেদালিয়া ক্রীতদাসদের সঙ্গে সংগ্রামে অংশ নেয়। গেদালিয়ার শ্রেণীহীন সমাজচেতনার পেছনে সত্যেন সেনের শ্রেণীসচেতন মার্কসীয় দৃষ্টি কাজ করেছে। যদিও ক্রীতদাসী সারার সঙ্গে প্রেমই তার এই উত্তরণের পেছনে সক্রিয় ছিল, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজ বিবর্তন ধারায় গেদালিয়ার চরিত্রটি প্রগতিশীল চিন্তাকে ব্যক্ত করেছে। এ কারণে 'অভিশপ্ত নগরী' কেবল জেরুজালেম নগরী ধ্বংস বা ইহুদি জাতির পতনের কাহিনী মাত্র নয়, শ্রেণীচেতনার পরিচয়ে তথা সমাজ পরিবর্তনে প্রগতিশীল চেতনার অনতিক্রান্ত শব্দরূপও হতে পেরেছে।

'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস, পটভূমি ও জীবনবোধের সঙ্গে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মিল আবিষ্কার কোন কাকতালীয় ব্যাপার নয়, প্রায় সমান্তরাল। আত্মদ্বন্দ্বে পরাজিত, নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত, চরিত্রহীন বাঙালি জাতির সঙ্গে জেরুজালেমের খ্রিস্টপূর্ব ইহুদি জাতির মিল খুবই নিকটবর্তী। রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্র ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত, ধর্মহীন, নীতিহীন, অত্যাচার, অনাচারে বিপর্যস্ত যেরেমিয়া যখন যিহোবার প্রত্যাদেশ প্রচার করে, তখন উভয় শক্তিই তাকে প্রতিপক্ষ মনে করে। রাজা এবং পুরোহিত যেরেমিয়ার সাবধান বাণী অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। তার জন্য বিচারসভার আয়োজন করে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেরেমিয়ার মুক্তি দাবি নিয়ে বাইরে জড়ো হয়। অধ্যক্ষগণ যেরেমিয়াকে মুক্তি দেয়াই সঙ্গত মনে করে এবং জনতা তাকে নিয়ে আনন্দ প্রকাশে উদ্যোগী হয়। তখনই জনতার উল্লাস ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায়। বাবিলের ক্যালদীয় সৈন্যরা জেরুজালেম আক্রমণ করে। অবরুদ্ধ ও লুণ্ঠিত হয় নগরী।

রাজা যিহোইয়াকীন তার মা বেহুশতা, তার পত্নীগণ, কুলপতিগণ আর নগরের যোদ্ধাদেরকে বন্দি করে বাবিলে পাঠানো হয়। ক্যালদীয়রা অভিজাত পরিবারের বাছা বাছা সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল। যে মেয়েরা কখনো পায়ে হেঁটে পথ চলেনি, তাদের অনাবৃত সুকোমল মুখমণ্ডল প্রখর সূর্যের তাপে

Dhaka University Institutional Repository

ফুলের মতোই শুকিয়ে উঠল। ভয়ার্ত হরিণীর মতোই ওরা কাঁপছিল আর ব্যাকুল চোখে চারদিকে তাকাচ্ছিল।

বিপুল ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলা এভাবে বহিঃশক্তির আক্রমণের শিকার হয়েছে বারবার। লুণ্ঠিত হয়েছে এদেশের সম্পদ, ধর্ষিতা হয়েছে বাংলার কুলবধূ যুবতী। মিথকথার সঙ্গে সমকালীন সমাজ-ভাবনা ও জীবনচেতনাকে সম্পৃক্ত করে শ্রেণীসচেতন অঙ্গীকারে সত্যেন সেন আবিষ্কার করতে চেয়েছিল জাতিসত্তার নতুন সম্ভাবনা। অহিকমের পুত্র গেদালিয়ার ক্রীতদাস আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মৌলসত্য ও জীবনার্থ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দাসপ্রেমিক গেদালিয়া জননী জিল্লার উদ্দেশ্যে পাঠানো পত্রে বলেছে–

> "সেই দৃষ্টি নিয়েই আমি আমাদের এই ভাঙ্গাচোরা, জীর্ণ আর রক্তমাখা সমাজে বসে আর একটি অপরূপ সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখি। যে স্বপ্ন একদিন সত্য হয়ে উঠবে। এত দুঃখ, এত ব্যথা, এত অশ্রু তার মাঝখানে বসেও আমি আমার স্বপ্নলোকের স্বাদ-গন্ধ অনুভব করি।" (অভিশপ্ত নগরী, পরিচ্ছেদ॥ বাইশ)

সত্যেন সেন মূলত মার্কসীয় দর্শনজাত শ্রেণীহীন জীবনচেতনার স্বপ্নময় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তার উপন্যাসের মিথিক সম্ভাবনার মধ্যে সেই শ্রেণীসচেতন জীবনচেতনাই শিল্পিত হয়েছে।
তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯)। এ উপন্যাসে 'অভিশপ্ত নগরী'র ভাববস্তু, জীবন-কল্পনা ও চরিত্র-ভাবনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে বাবিল সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনীকে আশ্রয় করে শাসকদের নির্যাতন, ধর্মন্মোদনা, রক্ষণশীলতা ও পরজাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যদিয়ে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ সত্য বিধৃত হয়েছে।

'পাপের সন্তান' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে ঔপন্যাসিক দৃষ্টিকোণ, জীবনবোধ, সময় ও সভ্যতার বিবর্তনশীল চেতনা, মানবীয় অস্তিত্ব সংগ্রামের বহুমাত্রিক জিজ্ঞাসা নবতর তাৎপর্যে অভিষিক্ত। বাবিল রাজ নেবুকাডনাজার কেবল জেরুজালেমকে ধ্বংসস্তূপেই পরিণত করেনি, নগরীর ইহুদীদের বাবিলে নির্বাসিত করে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। নির্বাসিত ইহুদিদের সঙ্গে ক্যালদীয়দের রক্তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের নায়ক মিকা, বাবিলের জন্মজাত ইহুদির একজন। ক্রীতদাস হলেও সে অন্যান্য ক্রীতদাসের মত গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্ত। প্রভু নারগেল সারজের স্নেহের আশ্রয়ে এবং প্রভুর কন্যা শদরার প্রণয় স্পর্শ তার দাসজীবনকে করেছে আনন্দময়। একটি ইহুদি মেয়ে ধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে তার জীবন অন্যরকম হয়ে যায়। স্বাজাত্যবোধ ও আত্মপরিচয় উজ্জীবিত মিকা উপলব্ধি করে 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আমি একজন ইহুদি' এই বোধ চেতনা থেকেই সে মূল্যবান পোশাক, স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন তুচ্ছ করে বাবিল ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যালদীয়দের অত্যাচারে পীড়িত মিকার মন বিদ্রোহের আগুনে ভরে ওঠে। শ্রেণীচেতনা তাড়িত মিকা আবাল্যের সাথী প্রিয়া শদরার উদ্দেশ্যে তাই বলে–

> "শদরা, তোমরা প্রভু। আর আমরা তোমাদের ভারবাহী দাস্য, ভূমিদাস। ইহুদীর দল তাদের রক্ত জল করে ফসল ফলায়, কাঠ কাটে, বোঝা বয়, তাদের সেই মেহনতের উপরে তোমাদের বিলাস সৌধ গড়ে ওঠে। শদরা, তোমরা চাবুক মারো আর আমরা আর্তনাদ করে মরি, তোমাদের সঙ্গে এই তো আমাদের সম্বন্ধ। আমাদের ঘরের সুন্দরী মেয়েদের ক্যালদীয় প্রভুরা উচ্ছিষ্ট করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমরা কথাটি বলতে পারি না। কার কাছে নালিশ জানাব।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের কথায় কেউ কান পাতে না, বরং তাতে বিপদ আরো বেড়ে ওঠে। আমরা শুধু আকাশের দিকে চেয়ে যিহোবার কাছে নালিশ জানাই আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি।" (পাপের সন্তান, পরিচ্ছেদ ॥দুই)।

মিকা বাবিল ত্যাগ করে জেরুজালেম যাত্রাকালে প্রেমিকা শদরাও তার সঙ্গী হয়। কিন্তু জেরুজালেম এসে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। জেরুজালেম এসে মিকা গরিব ইহুদিদের দুঃখ লাঘবে প্রাচীর নির্মাণে সচেষ্ট হয়। স্বাজাত্যবোধ চেতনা হতে মিকার মধ্যে ক্রমশ জেগে ওঠে নিজের শ্রেণীভাবনা ও শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ।

'মিকা হেসে বলল, -----যখন বাবিল ছাড়ার সময় হল, মনে পড়ছে গরিব ইহুদি ভাইদের ডেকে বলেছিলাম চলো, চলো আমরা যিহোবার রাজ্যে যাই, সেখানে বড় নাই ছোট নাই, উঁচু নাই নীচু নাই, ধনী নাই নির্ধন নাই– এমনি কত কথাই না বলেছিলাম, যারা জীবনে কোনদিন সুখের মুখ দেখেনি। আমার কথা শুনে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জেরুজালেমে এসে তারা কি দেখল? আর আমিই বা কি দেখলাম? আমার নিজের রচিত স্বপ্নে আমি ডুবেছিলাম। কিন্তু প্রবেশ করার প্রথম দিনেই গরিব ইহুদিদের পাড়ায় গিয়ে যখন ঢুকলাম, আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। দেখলাম, গরিব ইহুদিদের প্রতি ভদ্র ইহুদিদের মনে কী অপরিসীম ঘৃণা! এরা তাদের কাছে অশুচি। তখন ভাবলাম, ক্যালদীয়েরা তাহলে আর কি এমন বেশি অপরাধ করেছিল! আমার যেন আর সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না, আমি হতাশ ও অবসাদে ভেঙ্গে পড়লাম।" (চব্বিশ পরিচ্ছেদ॥পাপের সন্তান)

গোষ্ঠী বিভেদ দূর হলেও শ্রেণী সংঘর্ষ যে কত ভয়াবহ, এখানে তারই পরিচয় প্রকাশিত।

অন্যদিকে ধর্মীয় প্রধান আচার্য ইস্রার কাছে আসা শদরার বাবা নারগেল শারেজের পাঠানো খোলা চিঠি থেকে মিকা জানতে পারে যে, সে নারগেল দাসীর পুত্র অর্থাৎ মিকা ও শদরা একই পিতার সন্তান। নিজের এরকম জন্ম পরিচয় উদঘাটিত হওয়ার পর বিচার সভার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের কথা জেনেও মিকা জেরুজালেম ছেড়ে পালাতে চায়নি। জেরুজালেম ও ইহুদি সমাজ নিয়ে তার মনে ছিল স্বপ্ন। নারগেল সারেজের চিঠি পাওয়ার পর তার আত্মদ্বন্দ্ব ও সমাজ দ্বন্দ্বময় জীবনের সংগ্রাম আরো তীব্রতর হয়। যদিও ধর্মের অমোঘ বিধান ও আত্মপরিচয়ের গ্লানিকর পরিস্থিতি তাকে জেরুজালেম ত্যাগ করতে বাধ্য করে শেষ পর্যন্ত। মিকা চরিত্রটি কর্মে উদ্দীপনায়, সংযমের প্রতিশ্রুতিতে মানবিকতা ও ভালবাসায় যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনি ধর্মীয় বিধানের বিরুদ্ধে মানসিক দ্বন্দ্ব, শ্রেণীদ্বন্দ্বে এ চরিত্রটি বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের মিকা চরিত্রের সঙ্গে সমকালীন বাঙালির সচেতনতাকে সমন্বিত করার মধ্যে ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের প্রজ্ঞাময় পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এছাড়া জেরুজালেমের প্রাচীর তৈরির সময় তীরশথ নেহেমিয়ার উৎসাহ ও ইহুদি ঐতিহ্যের প্রতি তার গৌরববোধের প্রেক্ষিতে প্রাচীর তৈরির কাজে নিয়োজিত একজন সাধারণ ইহুদির উক্তিতে শ্রেণীচেতনার তীব্র শ্লেষ ধরা পড়ে।

"-----আমাদের এই ভাঙ্গাচোরা ঘরগুলোর দিকে একবার তাকান, আর একবার তাকিয়ে দেখুন আমাদের এই কংকালসার বাচ্চাগুলোর দিকে। এদের দিকে তাকালে গর্ব আর গৌরবের কথাটা কি ঠাট্টার মতোই মনে হয় না?...

ঃ বলছি আমাদের সেই সব ধনী ইহুদি ভাইদের কথা, যারা এতদিন ধরে আমাদের হাড়-মাংস চিবিয়ে খেয়েছে, আবার খাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ আকালের সময় আমরা ওদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলাম, সেই ঋণ সুদসহ পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছে। আর তারই দায়ে আমাদের ভিটেমাটি জমি ওদের হাতে বাঁধা পড়েছে। আর আমাদের ছেলেমেয়েগুলো ওদের বাড়িতে দাসদাসী হয়ে গরু-ভেড়ার মতোই আটকে আছে।

ঃ হায় যিহোবা, আপনি কি তা-ও জানেন না! এই ঋণ শোধ করা আমাদের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। আমাদের ছেলেমেয়েদেরও আমরা আর ফেরত পাব না। পরজাতীয়দের বিরুদ্ধে আমরা কত কথা বলি, কিন্তু আমাদের এইসব ধনী ইহুদি ভাইরা কি তাদের চেয়ে কোন অংশে কম?" (আঠার পরিচ্ছেদ॥পাপের সন্তান)

পরজাতীয়দের থেকে স্বজাতীয় শ্রেণীবৈষম্যের এই নির্যাতন-নিস্পেষণ, এই সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের অভিলাষ এমনিভাবে উচ্চকিত হয়ে আছে, 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের প্রায় সম্পূর্ণ আখ্যান জুড়েই।

প্রকৃতপক্ষে পাপের সন্তান উপন্যাসে ইহুদি সাধারণের প্রাণপাত প্রচেষ্টার ফলে নতুন জেরুজালেমের প্রাচীর গড়ে ওঠার পরও দেখা গেল ধর্ম-উন্মাদ ইহুদি সমাজপতিদের ধর্মের গোঁড়ামি, কঠিন রক্ষণশীল মনোভাব ও তীব্র পরজাতি বিদ্বেষ সমাজকে এক আত্মধ্বংসী আবর্তের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। ধর্মপতিরা মানবীয় আবেগের বিরুদ্ধে গিয়ে ধর্মাদেশ প্রচার করল যে, যারা কানানীয়, হিত্তিয়, পারসীয়, যিবুষীয়, আর্মেনীয়, মোড়াবীয়, সিস্রীয় ও ইমারীয় লোকদের ঘৃণ্য আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি পালন করে চলেছে। তারা নিজেদের পুত্রদের জন্য তাদের কন্যা গ্রহণ করেছে। এভাবে ইহুদিদের পবিত্র রক্ত মিথ্যাদের তার পূজক কদাচারী, অশুচি ও পরজাতীয়দের দূষিত রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত করেছে। কাজেই সেসব ইহুদিকে পরজাতীয় স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং এই পুত্র কন্যারা 'পাপের সন্তান' বলে আখ্যা পেল, এভাবেই ধর্মীয় অন্ধতার বেদীমূলে নিস্পাপ, নিষ্কলঙ্ক পাপের সন্তানদের বলি হতে হয়।

কিন্তু পরিশেষে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু শ্রেণী, ভিন্ন সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণীসংঘাত ডিঙ্গিয়ে মানবিক মুক্তি, আত্মার জাগরণ ও জয়কে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে শ্রেণীচেতনার সদর্থক ভূমিকা 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের রসনিস্পত্তি ঘটিয়েছে।

এ কারণে উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি, ধর্ম-উন্মাদনা ছাপিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ এক মানবিক বোধের উজ্জীবন। আত্মবিনাশের পরিবর্তে এক সদর্থক মীমাংসায় উপনীত হয়ে পাপের সন্তানের বলি মিকা উচ্চকিত হয়ে ওঠে মানবিক বোধের শুদ্ধ চেতনায়।

"আমার মন সুস্থ হয়ে উঠল, সাহসী হয়ে উঠল। নিস্পাপ আমরা, নিষ্কলংক আমরা, আমরা কেন ওদের কাছে মাথা নত করে থাকবো? কে, কবে তার অসংযত প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ফলে এক সন্তানের জন্ম দিয়েছিল তার দায়-দায়িত্ব কি আমাদের বয়ে নিয়ে চলতে হবে? বাইরের লোকের কাছে যাই হই না কেন আজ আমার নিজের মনের কোনই গ্লানি নেই।" (পরিচ্ছেদ উনত্রিশ॥ পাপের সন্তান)

এভাবেই সত্যেন সেনের 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে বাবিল সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনীকে আশ্রয় করে শাসকদের গণনির্যাতন, ধর্ম-উন্মাদনা, রক্ষণশীলতা ও পরজাতি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ বিধৃত হয়েছে।

'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে বাংলাদেশের এককালীন ধর্মযাজক, সামন্তপ্রভু ও সম্রাটের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত কৈবর্তদের বিদ্রোহের কাহিনী রচনা করা হয়েছে। ইতিহাস অবলম্বী হলেও বিদ্রোহী কৈবর্ত উপন্যাসের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়নি। গৌড় রাজের সঙ্গে কৈবর্তদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত রূপায়ণের প্রশ্নে

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন সেন শোষণ-নিপীড়ন ও সংগ্রামের চিরায়ত কাঠামোকেই গ্রহণ করেছেন। মানুষের সমগ্র সংগ্রামের মূলে শ্রেণীচেতনার উপস্থিতি যে অনিবার্য, কৈবর্তদের জাগরণের রূপ ও স্বরূপ অংকন করতে গিয়ে সে সত্যকে তিনি পরম বলে গ্রহণ করেছেন। জমির স্বত্বাধিকারের প্রশ্নে কৃষক কৈবর্তরা যখন উচ্চারণ করে : 'জমির আবার কর কি? এ নিয়ম কোনকালে ছিল না? চাষী আর জমি কি আলাদা? এ মাটির স্বত্ব নিয়েই আমরা জন্মাই।'– তখন তেভাগা আন্দোলনের 'লাঙল যার জমি তার' তত্ত্বের প্রতিধ্বনির মতই মনে হয়। সত্যেন সেনের অপর উপন্যাস 'পুরুষমেধ' (১৯৬৯)। 'পুরুষমেধ' উপন্যাসে শ্রেণীসংগ্রামের আধুনিক যুগসত্য ব্যক্ত করাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। এতে শূদ্র শিশু খেতুর বলির পর যুগ-যুগান্তের শোষিত ও নির্যাতিত শূদ্রদের মধ্যে জাগরণ এবং রাজা বৃষকেতু ও প্রভু শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভের কাহিনী সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। ধর্মান্ধতা ও শাস্ত্রানুগত্যের মানবতা বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে মানুষের সর্বকালের বিদ্রোহই এ উপন্যাসের কাহিনী পটে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ সত্যকে তুলে ধরে।

পরিশেষে বলব, সত্যেন সেনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ইতিহাস ও মিথ আশ্রয়ী উপরে আলোচিত সব উপন্যাসের বিষয়-ভাবনায় ধর্ম শোষণ, জাতি শোষণ ও শ্রেণী শোষণের নিগড় থেকে মুক্তিলাভের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির সাহায্যে সামাজিক গতি এবং ব্যক্তির ক্রমবিকাশের পরম্পরিত জটিল অবস্থার রূপায়ণের মাধ্যমে সত্যেন সেন এভাবেই তাঁর উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ সত্যকে বিধৃত করেছেন।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

শক্তিমান কথাশিল্পী শওকত ওসমান সামাজিকভাবে যথেষ্ট সচেতন। সমাজের পরিবর্তন ধারাটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি অবলোকন ও অনুধাবন করেছেন। বিভাগোত্তর ও স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলার সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন তার উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রেণীচেতনা বিষয়টিও তার উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৪৭-'৭১ কালসীমায় তাঁর যে ক'টি উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো হল: বনি আদম (১৯৪৩), জননী (১৯৬১) চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০) এবং ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬৩)।

শওকত ওসমানের প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'জননী' (ঢাকা, ১৯৬১)। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনধারার শ্রেণীগত সত্য ধরা পড়েছে উপন্যাসটিতে। ঘটনাস্থল পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙ্গা এবং সময় ও সমাজপ্রবাহ বিভাগ পূর্ববর্তীকালের। বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলন থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ উপন্যাসের ঘটনাংশ বিস্তৃত। মুসলমান সমাজের শরিয়তী দ্বন্দ্ব (হানাফি ও লা মাজাহাবি) বিত্তবানের স্বার্থপরায়ণতা এবং স্বল্পবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকদের পারস্পরিক সম্প্রীতিমূলক জীবনযাত্রা এ উপন্যাসে পরিস্ফুট।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র এককালের সম্ভ্রান্ত বংশ মর্যাদার দাবিদার পরিবারের সন্তান নিম্নবিত্ত আজহার এবং হিন্দু নিম্নবিত্ত চন্দ্র কোটাল পরিবারের সদ্ভাব সম্প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আজহারের সর্বশেষ কর্মক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের মধ্যকার পারস্পরিক সদ্ভাব-সম্প্রীতিমূলক জীবনচিত্রের পাশাপাশি বিশেষত চন্দ্র কোটাল চরিত্রের মাধ্যমে বিত্তবানদের বিরুদ্ধে নির্বিত্তদের সচেতন ও সংগঠিত হবার

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিতও লেখক তুলে ধরেন এ উপন্যাসে। ফলে শ্রেণীচেতনার নয় শুধু শ্রেণীসংগ্রামেরও উন্মেষ লক্ষ করা যায় এ গ্রন্থে।

নিম্নবিত্ত জীবনে দারিদ্র্য এবং ধর্মাচ্ছন্নতা উভয়ের নেপথ্য ভূমিকায় শ্রেণীশোষণ তীব্রতা পায় 'জননী' উপন্যাসে। তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ করি। দারিদ্র্য এবং ধর্মের যোগাযোগ উপন্যাসটিতে ব্যঙ্গের আধারে উপস্থাপিত। মহেশডাঙ্গা গ্রামে হাতেম বখশ এবং রোহিনী চৌধুরী অধিক প্রতাপশালী। হাতেম বখশ খাঁ গ্রামবাসীকে জড়ো করে নিজের দল ভারি করতে চায়; উদ্দেশ্য রোহিনী চৌধুরীর সমকক্ষতা অর্জন। কিন্তু হাতেম বখ্‌শ গ্রামবাসীকে দলে টানে ধর্মের দোহাই দিয়ে। সাধারণ মানুষের ধর্মভাবকে প্রবল থেকে প্রবলতর করে সে এর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িতা ছড়িয়ে দেয় গ্রামে।

ধর্মাচ্ছন্ন দরিদ্র মানুষকে হীন স্বার্থে কাজে লাগানোর সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে যে কাজ হয়, সেটাও দেখিয়েছেন শওকত ওসমান। আজহার এবং চন্দ্র কোটাল পরস্পরের প্রতিবেশী– উভয়েই দরিদ্র কৃষক। কিন্তু গ্রামের ধর্মকেন্দ্রিক উত্তেজনা তাদের মধ্যে সহজেই সৃষ্টি করে বিভেদের দেয়াল। ফলে আজহার চন্দ্র কোটালকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। দারিদ্র্যের পরিচয়ে তারা সমান অবস্থানে থাকলেও ধর্মের বিভিন্নতা তাদের মধ্যে আনে পৃথকতা। চন্দ্র কোটাল সমাজের ধর্মাশ্রিত সাম্প্রদায়িকতাকে আক্রমণ করে রূঢ় ভাষায়–

"ধর্মের নিকুচি। যতসব চালবাজি শালাদের ঝগড়া লাগানোর।"[১৪]

শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিণতি হয় ভয়াবহ। দুই জমিদারের অধিকারাধীন 'জলকর লইয়া দাঙ্গার সময়' নিহত হয় দুই ধর্মের গরিব গ্রামবাসী। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সমাজের যে কোন স্তরে উদ্ভূত হলেও তা যে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনেই ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে, 'জননী' উপন্যাসে আমরা তার পরিচয় পাই। শওকত ওসমান অবশ্য মর্মান্তিক পরিণতির মধ্য দিয়ে নতুন উপলব্ধির জাগরণকে চিহ্নিত করেছেন। তাই দেখি, প্রচণ্ড ধার্মিক আজহারের মধ্যেও এক সময়ে সূচিত হয় পরিবর্তনের আভাস। নির্মোক ঢাকা সত্য ক্রমশ আলোকিত হয়ে ওঠে তার মনে–

"বড় লোকে বড় লোকে দলাদলি, আমরা গরিবেরা কেন ওর মধ্যে?" শিশুপুত্র আমজাদের 'ভগবান মানে আল্লা, না?' প্রশ্নের জবাবে আজহার বলে 'হ্যাঁ'।– শওকত ওসমানের সমাজচিন্তা এখানে মানবিকতার বোধে উত্তীর্ণ। কঠিন জীবনসংগ্রামে অহর্নিশ-লিপ্ত সমাজের হতদরিদ্র মানুষদের মধ্যে তিনি শ্রেণীসচেতন স্বচ্ছ জীবনবোধের সন্ধান পান। সমাজের নেতিবাচক অবস্থার মধ্যে তিনি জাগিয়ে তোলেন আশার সম্ভাবনা।

অনিশ্চয়তাপূর্ণ-নিরাপত্তাহীন সমাজব্যবস্থার মধ্যে গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার কঠিন জীবন-সংগ্রাম 'জননী' উপন্যাসে লক্ষ করার মতো। উপন্যাসের প্রতিটি শ্রেণীচরিত্র কোন না কোনভাবে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করছে টিকে থাকার জন্য। খণ্ড খণ্ড চিত্রে এরকম বেশ ক'টি চরিত্র গড়ে উঠেছে, যারা সম্মিলিতভাবে এক অনিঃশেষ সংগ্রামকে তুলে ধরে। এখানে প্রত্যেকের সংগ্রামই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা তাদের নিজস্ব অস্তিত্বের কাছে অর্থবহ। আজহারের মতো চন্দ্র কোটালও নিত্য লড়াই করে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। সে যখন সৃষ্টিকর্তার ওপর অনাস্থা প্রকাশ করে, তা কোন বিশেষ দর্শনজাত নয়; সেটা তার চোখে দেখা সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার নিজস্ব প্রতিবাদ। এসব চরিত্রের মধ্যে আজহার ও দরিয়ার জীবনসংগ্রাম আলাদাভাবে বিস্তৃত পরিসরে খানিকটা বড় জায়গা পায়। আজহার সংগ্রামরত বাইরের জীবনের মধ্যে, আর দরিয়া ভেতরে তথা পরিবারের গণ্ডিতে। গ্রামের কৃষি-জীবন এবং গ্রামের বাইরে মফস্বল শহরের শ্রমজীবনের টানাপোড়েনে ক্লান্ত চাষী আজহার। ভূমির স্বল্পতার কারণে বারংবার তাকে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয় বিকল্প পেশার খোঁজে। প্রতিবারই সে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসে পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে; আজহারের অনিশ্চয়তাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে বাংলার শত-সহস্র কৃষিজীবী মানুষের জীবন-সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে। এমনকি আজহারের মৃত্যুর পরেও শেষ হয় না জীবনের লড়াই। সেটা অব্যাহত অন্য মাত্রায়। অন্তঃপুরবাসী দরিয়া পরিবারের ক্ষুদ্রগণ্ডিতে আবদ্ধ থাকলেও তার জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণা, জঠরজ্বালা মেটানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা এসব মোটেও ক্ষুদ্র নয়। আজহারের মৃত্যুর পরেই শুরু হয় তার পত্নী দরিয়ার অস্তিত্বের প্রকৃত পরীক্ষা। আজহারের মৃত্যুতে বহির্জগতে সংগ্রামকারী এক লড়াকু ব্যক্তির জীবন-অধ্যায়ের যতিপাত; আর দরিয়ার জীবন-যুদ্ধ আজহারের মৃত্যুর পর হতে থাকে তীব্রতর। দরিয়া তার জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যায় অন্তঃপুরে থেকেই। কিন্তু সমাজের প্রকৃত অবয়বটা ঠিকই আমরা পেয়ে যাই দরিয়ার সূত্রে। দরিয়া চরিত্রের মহিমান্বিত পূর্ণতায় লেখকের সমাজমনস্কতা শ্রেণীচেতনা ও মানবিকতার বোধ সবকিছুর চূড়ান্ত বিকশিত রূপ ফুটে ওঠে।

দরিয়ার জন্ম এবং বেড়েওঠা অপ্রসন্ন অবরুদ্ধ সমাজের মধ্যে। সমাজের বৈষম্যের কারণে যে কষ্ট তার জন্য অবধারিত, তাকে জয় করার চেষ্টা সে অব্যাহত রাখে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। গ্রামের স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ইয়াকুব দরিয়ার দারিদ্র্যে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে। শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও দরিয়া ইয়াকুবের দান হাত পেতে নিতে অস্বীকার করে, সেই দরিয়াই স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় অবস্থায় বাধ্য হয়েছে ইয়াকুবের দেয়া অর্থ নিতে। ইয়াকুব সেই সাহায্যের সুবাদে এক পর্যায়ে তার লাম্পট্য চারিতার্থ করে। এর মধ্য দিয়ে দরিয়া বিবি চরম সামাজিক নিগ্রহের শিকার হয়। প্রচলিত সামাজিকতায় সমাজের ধিক্কার কুড়ায় নির্দোষ নারী দরিয়া বিবি; কিন্তু সত্যিকারের অপরাধীর নামটাও কেউ জানতে পারে না। তাই এক অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে এই বেদনার্ত জননী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় তথাকথিত সমাজের সামনে নিজের সম্ভ্রমটুকু রক্ষার তাগিদে।

আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে দরিয়া হয়ে উঠেছে মহিয়সী জননী। নিজের গ্লানিকর অপমানজনক সত্তার সে বিনাশ ঘটায় আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে, কিন্তু গর্ভের সন্তানকে রেখে যায় পৃথিবীতে। দরিয়ার গর্ভের সন্তান ইয়াকুবের ব্যভিচারের ফল হলেও সে দরিয়ার করুণ-কষ্টকর জীবনের স্মারক। যে সমাজ দরিয়ার বাঁচার নিশ্চয়তা দেয়নি, সেখানে এক দরিদ্র অনাথ শিশু-সন্তানের কোনই মূল্য নেই। তবু আমরা দেখতে পাই, বিত্ত-বৈভবহীন মানুষের স্তর থেকে ওঠে আসে সম্ভাবনার ইঙ্গিত। দরিয়ার প্রতিবেশী নিঃসন্তান হাসু বৌ নিজের কোলে আশ্রয় দেয় সদ্যোজাত শিশুটিকে। এক জননীর প্রস্থানের পটভূমিতে আবির্ভূত অন্য এক জননী। গ্রামবাংলার অবহেলিত দরিদ্র রমণীরা এভাবেই জননীর স্বরূপে লালন করে যায় দুঃখ-কষ্টের বোঝা। দরিয়ার আত্মহত্যা বৈষম্যমূলক সমাজের বিরুদ্ধে এক নারী এবং এক জননীর প্রতিবাদ।

এভাবেই শ্রেণীচেতনা 'জননী' উপন্যাসের রূপায়িত হয়ে উঠেছে। সেই সাথে ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর পরিণতিতে গ্রামগুলোর ভাঙ্গন, মন্বন্তরের করাল গ্রাস, বিশ্ব যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিশ্ব বাজারের যোগসূত্রে স্থানীয় বাজারের অগ্নিমূল্য, এসবের প্রেক্ষাপটে আজহার, চন্দ্র কোটাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র কৃষকের সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ে 'জননী'র সমাজচিত্রণ হয়েছে অর্থপূর্ণ। সামাজিক বৈষম্যের পীড়ন এসব চরিত্রের দুঃস্থ অবস্থা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে যখন দেখা যায়, আজহার এবং চন্দ্র কোটাল তাদের ক্ষুদ্র জমির ফলনে চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ এবং বিকল্প জীবিকার খোঁজে আজীবন অভ্যস্ত কৃষিকাজ ছেড়ে একজন ভাঁড়ের দলে এবং অন্যজন রাজমিস্ত্রির কাজে যোগ দেয়। সমাজের এসব টুকরো টুকরো নেতিবাচক চিত্রের মাঝখানে ভয়াবহ নেতির বাহক হয়ে আসে দরিয়ার আত্মহত্যা। উপন্যাসের শুরু হয় মহেশডাঙ্গার এক সাধারণ চাষী পরিবারের কাহিনী বর্ণনা দিয়ে। উপন্যাস যখন শেষ হয়, ততক্ষণে সেই চাষী পরিবারটির জীবনের সমস্ত ছন্দ, সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গেচুরে যায়। এমনকি পরিবারের যে সদস্যরা বেঁচে থাকে তারাও গ্রাম ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত 'চেনা-অচেনা সড়কের দিকে'। আত্মহত্যার মাধ্যমে দরিয়া যে সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে, অন্যেরা সে সমাজ থেকেই প্রস্থান করেছে অন্যভাবে গ্রাম ছেড়ে যাবার মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে। এভাবেই প্রচলিত সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণীচেতনা বিষয়টি 'জননী' উপন্যাসে রূপ পেয়েছে।

শওকত ওসমানের অপর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বনি আদম' (১৯৪৩)। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হারেস। তার পিতা ছিল তন্তুবায় সম্প্রদায়ের লোক। পিতৃ বিয়োগের পর পরজীবী ছিন্নমূল হারেস বেড়ে উঠেছিল মীরগাঁ নামক গ্রামে সলিম মুনশীর আশ্রয়ে, সলিম মুনশীর একনিষ্ঠ খেদমতগার হিসেবে। সে একা নয়, তার মায়ের সাথে সে সলিম মুনশীর বাড়ি আশ্রয় পেয়েছিল। মা ছিল বাড়ির পরিচারিকা, হারেসও তখন ফাঁই ফরমাস খাটত তার বাড়িতে। মাত্র আট বছর বয়সে নিরাশ্রয় হারেস মায়ের আশ্রয় বঞ্চিত হলেও জোতদারের আশ্রয়চ্যুত হয় না। প্রায় বিনা বেতনে কিছু খোরপোষের বিনিময়ে হারেস মুনশীর বাড়িতে থেকে যায়। হাবোগাবো গোবেচারী স্বভাবের জন্যও হারেসের প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু এই হারেসের মধ্যেও তার নিজ শ্রেণী অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা ও অস্তিত্বের জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। মূলত 'বনি আদম' উপন্যাসে হারেস চরিত্রের উত্তরণের মধ্য দিয়ে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ সত্য বিধৃত হয়েছে।

আশ্রয়দাতা মনিব সলিম মুনশী একদিন হারেসকে পাঠিয়েছিল এক আত্মীয়ের খোঁজ নিতে। সেখানে যাত্রাপথে এক মিটিং-এর বক্তৃতা শুনে হারেসের চেতনালোক আন্দোলিত হয়। সে শুনেছিল–

> "মানুষ, মানুষের ওপর জুলুম করে কেন? জীবনে সে প্রথম নাড়া খেয়েছে। সে তো মনিবের গোলাম। মনিবের খেদমত করাই ছাওয়াব-পুণ্যের শামিল। সভার বক্তা এই ফাঁকিবাজির বিশদ বিবরণ দিয়েছিল, কিভাবে আরাম-আয়েশ লুটনেওয়ালারা নিজেদের দৈহিক সুখ বজায়ে সমাজের আদব-কায়দা নির্মাণ করে। সেই কাহিনী শোনার পর ধোঁয়াতে শুরু করেছিল সে। দাউ দাউ জ্বলে উঠতে আরো পাঁচ বছর লেগে যায়।"[১৫]

অতঃপর একদিন হাবাগোবা হারেসের চৈতন্যতল থেকে উত্থিত হয় জোতদার সলিম মুনশীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী উচ্চারণ–

> "পনর বছর আপনার গোলাম। গোলামের মত মেহনত করেছি। তার কি কোন দাম নেই, বেতন নেই? ... এমন উচ্চারণ মনিবের কানে অবিশ্বাস্য। জন্মহাবা কি করে এমন উচ্চারণ করতে পারে।"[১৬]

আর এখান থেকেই ছিন্নমূল, ভূমিহীন, পরজীবী হারেসের শ্রেণী সচেতন, অস্তিত্বশীল চেতনার সম্মুখ যাত্রা উপন্যাসে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ক্রমশ পরজীবী হারেস পরিণত হয় শ্রেণী সচেতন শ্রমজীবী একজন মানুষে। সে বিয়ে করে সংসারীও হয়। অস্তিত্বশীল হারেস ক্রমান্বয়ে ঘরামি, রাজমিস্ত্রীর যোগালি, ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি করার কাজে অথবা মাঝে মাঝে কাজবিহীন অবসরে জীবিকার অন্যতর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়।

নগর জীবনে সে তার স্বাধীন সত্তার জাগরণকে খুঁজে পায়। আত্মোপলব্ধি করে জীবনের গন্তব্য সম্পর্কে:

> "সে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের লোক। মুসলমান ভাই ভাই হলেও সে 'জোলা' শিরোনামে অবজ্ঞাত। তার সঙ্গে শরীক মুসলমানরা এক কাতারে খেতেই বসবে না। আজ কার তোয়াক্কা? শহরে গিয়ে তার এতটুকু প্রত্যয় বেড়েছে নিজের রুজি নিজে উপভোগ করো। কারো ভ্রুকুটির জায়গা সেখানে নেই। গাঁয়ে এমন হটকারিতা অসম্ভব। হারেস তার হদিস করতে চায়। কিন্তু বুদ্ধিতে কুলায় না। পৃথিবীর বুকে যেমন নানা সম্পদ লুকিয়ে আছে, তেমনই সমাজের বুকে। খুঁড়ে বের করতে না জানলে মাথা ঠোকাই সার। নানা দুর্ভোগ তখন জমে থাকে মানুষের জন্য। অবশ্যি সব মানুষের জন্য নয়।"[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে শ্রমজীবী হারেস তার শ্রেণীগত বাস্তবতা উপলব্ধি করে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করায় মনস্থির করে। নগরের ভাসমান উদ্বাস্তু জীবন ছেড়ে সে গ্রামে হালচাষের মাধ্যমে ভূমিহীন অবস্থান থেকে ভূমি আশ্রয়ী জীবনের প্রত্যয়ে গ্রামেই থেকে যাবার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে। 'বনি আদম' উপন্যাসে ছিন্নমূল হারেসের এই আত্মোত্তরণের মধ্য দিয়ে শ্রেণীচেতনার পরিচয় সার্থকতার সাথে রূপায়িত হয়েছে।

পরবর্তী আলোচিত উপন্যাস 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৮)। বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রাম এবং সে সূত্রে প্রচলিত সামাজিক মানদণ্ডে তাদের কারো কারো অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার অনিবার্য শ্রেণীগত পরিণতি চৌরসন্ধি উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। উপন্যাসটিতে চৌর্যবৃত্তি ও গুন্ডামি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহে লিপ্ত বিত্তহীনদের জীবনসংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে মেথরবস্তি, সাঁওতাল ডেরা থেকে শুরু করে ক্ষুদে ও মাঝারি হোটেল এবং মধ্যবিত্ত গৃহের অন্তরালবর্তী চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। উঠতি বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অন্তঃসারশূন্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত জীবনযাত্রা ও তাদের আসল রূপ প্রাসঙ্গিকভাবে এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়াও শ্রমজীবী বিত্তহীনদেরকে অর্থের লালসায় প্রলুব্ধ করে বিত্তবান পুঁজিপতিরা কিভাবে হীনউদ্দেশ্য চরিতার্থ করে সমকালীন নগরজীবনের এই অনুদঘাটিত দিকটি এ উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণ।

গ্রন্থের নায়ক কাল্লুকে কায়িক শ্রমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলে কায়েমী স্বার্থ-চক্র ক্রমশ তাকে চুরি, গুন্ডামি ও ডাকাতিতে প্ররোচিত করে। কাল্লু প্রথমে চোর, তারপর গুন্ডা ও ডাকাতদের সর্দার হয়ে মিল-মালিক ও রাজনৈতিক নেতাদের হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়। কাল্লুর এ ধরনের পরিণতির বাস্তবোচিত আলেখ্য 'চৌরসন্ধি' উপন্যাস। এই বৃত্তির জোরে কাল্লু ধীরে ধীরে মিল-মালিক, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের রীতিমতো খাতিরের লোক হয়ে 'তুই' থেকে 'আপনি' সম্বোধনে আদৃত হয়েছে এবং সবশেষে একজন ব্যবসায়ী হয়ে বসেছে।

যখন সে চুরি বা ডাকাতি করত তখন বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত ঘরের বিশেষত দাম্পত্য-জীবনের অশান্তি এবং নৈতিক স্খলনের বাস্তবতা লক্ষ্য করে। কাল্লুর ডাকাতি-গুন্ডামির জগতটিও অবশ্য সমস্যা-সংকট মুক্ত ছিল না। নিত্য নতুন উৎকণ্ঠা, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়, সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতা, নতুন দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিপদ, বেকারত্ব, অনাহার, রোগ-ব্যাধি এবং অনিশ্চয়তার ভয়াবহ সংকট তার জীবনযাত্রাকে মাঝে-মধ্যে অচল করে ফেলেছে।

শওকত ওসমান দেখিয়েছেন, নিতান্ত বাঁচার তাগিদেই কাল্লু, বেচু সর্দার ও গফুরের পেছনে সমাজের সহায়-সম্বলহীনদের দল জড়ো হয় এবং অপরাধ করে। প্রচলিত সামাজিক আইনে এরা যদি অপরাধী হয় তবে বড় বড় চোর-ডাকাতরূপী বিত্তবান মিল-মালিক, রাজনীতিকরাই বা কেন অপরাধী বলে গণ্য হবে না? সমাজের কর্তাব্যক্তিরা এসব তথাকথিত অপরাধীদের চেয়ে মহৎ হয় কেমন করে? এ জ্বলন্ত প্রশ্নের আলোকেই লেখকের শ্রেণী-সচেতন জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 'চৌরসন্ধি'-তে প্রতিফলিত।

নির্যাতিত, শোষিত জনজীবনের মুক্তি ঐ শ্রেণীর সমষ্টি অস্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে সম্ভব হতে পারে তারই প্রতীকী প্রকাশ 'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭০) উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটির ঘটনাংশ পরিকল্পিত হয়েছে মহাকবি ফেরদৌসীর 'শাহানামা' কাব্যের অসমাপ্ত কল্পিত অংশ অবলম্বনে। ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা সমষ্টি স্বার্থের মূল্যচেতনা এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। উপন্যাসটির বর্ণিত ঘটনা লক্ষ করলে আমরা দেখি, অত্যাচারী-প্রজাপীড়ক রাজা জাহুক দৈববাণী কর্তৃক অভিশপ্ত হলে দু'টি বিষাক্ত কালো গোক্ষুর সাপ তাঁর গলদেশ বেষ্টন করে থাকে। এবং সাপ দু'টির প্রতিদিনের খাদ্য হিসেবে নির্দেশিত হয় বিশ থেকে পঁচিশ জন যুবক-যুবতী অথবা জ্ঞানী বৃদ্ধের মগজ। রাজা জাহুক যদি খাদ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাঁর মগজই হবে সাপ দু'টির খাদ্য। রাজার প্রাণ রক্ষার জন্য সিপাহি-সান্ত্রীরা নিরপরাধ

Dhaka University Institutional Repository

যুবক-যুবতী এবং ইলমদার বৃদ্ধদের বন্দি করে আনে সাপের আহার্য হিসেবে। প্রাণ-উৎসর্গকারীদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় তাদের অকাল ও মর্মান্তিক পরিণতির কার্যকারণ। অপরপক্ষে, মাতৃহীনা রাজকুমারী গুলশানের নিঃসঙ্গ জীবন ক্রমাগত অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে। পিতার জীবনরক্ষার জন্য প্রাণদানকারীদের প্রতি মমত্ববোধ থেকে সে বন্দিশালায় গমন করে এবং হরমুজ নামক এক সুদর্শন যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। হরমুজকে সে বন্দিদশা থেকে মুক্তিদান করলে হরমুজ তা প্রত্যাখ্যান করে। রাজদুহিতা গুলশানের নিকট থেকে শাপগ্রস্ত রাজা জাহুকের কাহিনী শোনার পর নিরপরাধ দেশবাসীর জীবনরক্ষার জন্য ঝুঁকি নিয়ে সে রাজার শাপমুক্তির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। তার তপস্যা সাফল্য অর্জন করে। রাজা জাহুক শাপমুক্ত হয়ে জীবন সংক্রান্ত এক নতুন বোধে উপনীত হন–

> "আমি জাহুক বাদশা নই। আমি নতুন রাজ্য গড়ব, যেখানে মানুষের জন্য কোন মানুষকে জুলুম ভোগ করতে হবে না। যে সকলের গোলাম হতে পারবে সে-ই হবে সকলের বাদশা।"[১৮]

এভাবেই এ উপন্যাসে রূপকের আশ্রয়ে ঔপন্যাসিক শোষিত, অবরুদ্ধ সমাজজীবনে ব্যক্তিস্বার্থ অপেক্ষা যে সামষ্টিক স্বার্থের জন্য মানুষের নিরন্তর সাধনা, তা-ই উপস্থাপিত করেছেন 'রাজা উপাখ্যান' উপন্যাসে। রাজা জাহুকের বন্দিশালা ষাটের দশকের স্বৈরশাসন কবলিত পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশের রূপক হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে বলা যায়। এ সময়ের আত্মবিবরকামী ও পলায়নপর সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে হরমুজকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন লেখক। এ চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে শ্রেণীবিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজে ব্যক্তিস্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করার নিয়মের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ। তাই অভিশপ্ত রাজা জাহুকের শাপমুক্তি এবং নতুন জীবনোপলব্ধিতে উত্তরণের মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার সদর্থক ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, শৃঙ্খল জর্জরিত সমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রতীকী ইঙ্গিত 'রাজা উপাখ্যান' উপন্যাসের অনন্যতাকে উপস্থাপন করেছে।

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের বিষয় ভাবনায় পাকিস্তান আমলের আয়ুবী শাসনের গণতান্ত্রিক অধিকারবর্জিত এবং সর্বপ্রকার স্বাধীনতাবঞ্চিত জনজীবনের সমস্যা ও সংকট হারুনর রশীদের বাগদাদের মধ্যযুগীয় পটভূমিকে আশ্রয় করে রূপায়িত হয়েছে। এই রূপকাশ্রয়ী উপন্যাসটিতে শ্রেণীচেতনার অন্তর্গত বাণীর স্বাক্ষরও সুস্পষ্ট।

উপন্যাটিতে ব্যক্ত জীবনার্থের মূলে রয়েছে মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি। সমাজে বিদ্যমান শ্রেণী অবস্থানের উঁচু-নিচু বিভেদ সত্ত্বেও নিপীড়িত মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার চেতনাকে স্তব্ধ বা হরণ করা সম্ভব নয়– তারই প্রতীকী প্রকাশ উপন্যাসটিতে বিধৃত।

উপন্যাসটির কাহিনী পর্যালোচনায় দেখি, প্রজাপীড়ক খলিফা হারুনর রশীদ অজস্র অপকর্মের স্মৃতিভার থেকে মুক্তিলাভের জন্য শান্তি সন্ধান করে ফিরছেন। এমন অবস্থায় একদিন তিনি তার হাবসী ক্রীতদাস তাতারী ও আর্মানীয় বাঁদী মেহেরজানের প্রণয়োচ্ছল হাসির লহরী শুনে, সে হাসিতে সুখের স্পর্শ খুঁজে ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠেন। উপন্যাসে দেখি তারই আবেগোত্থিত বর্ণনা–

> "স্মৃতিদংশিত, নিঃসঙ্গ মানসিক অবস্থায় শান্তিপিপাসু খলিফার শ্রুতিতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ক্রীতদাস তাতারী এবং বাঁদী মেহেরজানের প্রেমপূর্ণ মিলনের আবেগোচ্ছল হাস্যধারা। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ শোনার পর খলিফা উপলব্ধি করেন : 'এ হাসি ঠোঁট থেকে উৎসারিত হয় না। এর উৎস সুখ-ডগমগ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ। ঝর্ণা যেমন নির্জন পাহাড়ের উৎসঙ্গ-দেশ থেকে বেরিয়ে আসে উপলবিনুনী পাশে ঠেলে ঠেলে– বিজন পথভ্রষ্ট তৃষ্ণার্ত পথিককে সংগীতে আমন্ত্রণ দিতে--- এই হাসি তেমনই বক্ষঝর্ণা----উৎসারিত। কিন্তু কে এই সুখীজন, আমার

Dhaka University Institutional Repository

> হিংসা হয়, মশরুর। আমি বাগদাদ-অধীশ্বর সুখ-ভিক্ষুক। সে তো আমার তুলনায় বাগদাদের ভিক্ষুক, তবু সুখের অধীশ্বর! কে, সে?"[১৯]

এই অনুভবের প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে জন্ম দেয় ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা। 'ওরা হাসবে, আমি হাসতে পারব না? না, তা হয় না।' অথবা 'আহ্, ঐ হাসি আমি হাসতে পারতাম!'– এই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ খলিফা হাবসী ক্রীতদাস তাতারীকে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বাগদাদের একটি বাগিচায় দাসদাসী ও বিপুল সম্পদের মালিক করে দেন। আর মেহেরজানকে বেগম হিসেবে গ্রহণ করেন। মেহেরজান খলিফাকৃত ব্যবস্থা মেনে নিলেও তাতারী তা মেনে নিতে পারে না। তার হাসি স্তব্ধ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। ক্রীতদাসের উজ্জ্বল হাসি শোনার আকাঙ্ক্ষায় প্রথমে তাকে তুষ্ট করার পথ বেছে নেয় খলিফা। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে নির্যাতনকে পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেন। সম্পদ, ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা দিয়ে অনেক কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব, কিন্তু মুক্তপ্রাণের হাসি সৃষ্টি করা যায় না। মৃত্যুর প্রাক্কালে খলিফার উদ্দেশে তাতারীর উচ্চারণে এ সত্যই প্রতিবিম্বিত :

> "শোন, হারুনর রশীদ! দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব– কিন্তু– কিন্তু– ক্রীতদাসের হাসি–না–না–না–না–।"[২০]

উপন্যাসটিতে বিশেষ করে ক্রীতদাস তাতারীর মুখ নিঃসৃত উক্ত বাণীর মধ্য দিয়ে লেখক আসলে সেই শ্রেণী সত্যকেই রূপায়িত করেছেন যে, ক্ষমতা, অর্থ ও শক্তিবলে নির্বিত্ত মানুষের সুখ-শান্তি হরণ করা যায় ঠিকই, কিন্তু তার সত্তার স্বাধীনতা-স্বাধীকার চেতনাকে শত নিপীড়নেও স্তব্ধ করা যায় না। হাবসী ক্রীতদাস তাতারী চরিত্রের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এভাবেই শ্রেণীচেতনায় উত্তরণের দিক-নির্দেশ করেছেন।

সরদার জয়েন উদ্‌দীন(১৯১৮-১৯৮৬)

চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক– বিভাগ পূর্ববর্তীকাল থেকে বিভাগ পরবর্তীকাল এ দু'দশক কালসীমায় গ্রামবাংলার জীবনভাষ্য নির্মাণ করেছেন সরদার জয়েন উদ্‌দীন। ১৯৪৭-'৭১ কালপর্বে সরদার জয়েন উদ্‌দীনের দু'টি উপন্যাস 'শ্রেণীচেতনা' বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। উপন্যাস দু'টি হল– 'আদিগন্ত'(১৯৫৯) এবং 'অনেক সূর্যের আশা' (১৯৬৭)।

দেশ বিভাগ পরবর্তী বাংলার গ্রামীণ জীবননির্ভর 'আদিগন্ত' উপন্যাসটি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে সমাজিক বাস্তবতার এক নিরাভরণ শিল্পরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাক্ষত সময় পরিসর, এ উপন্যাসের কাহিনীকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গতিশীল পটভূমিকায় বিন্যস্ত করেছে। আলোচ্য উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার পরিচয় থাকলেও শ্রেণী সংগ্রামের মীমাংসিত উত্তরণ এতে অনুপস্থিত। উপন্যাসটিতে লেখক সমাজদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিচিত্র রূপ অংকনের পাশাপাশি ব্যক্তি মানুষের প্রেম, দুঃখভোগ ও প্রাপ্তির প্রতিও ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। ফলে শোষক ও শোষিতের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিরূপিত হলেও আলোচ্য উপন্যাসে শ্রেণীচেতনায় সমৃদ্ধ মীমাংসায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন সরদার জয়েন উদ্‌দীন।

পদ্মা তীরবর্তী গ্রাম নবীনগর 'আদিগন্ত' উপন্যাসের ঘটনাস্থল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রামরত মানব-মানবীরা ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অস্তিত্বের প্রশ্নে সংগ্রামশীল। কিন্তু যুদ্ধ ও দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ এই

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীকে অস্তিত্বের প্রান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। যুদ্ধ দাঙ্গার সেই রূপ ঔপন্যাসিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র স্কুল শিক্ষক ছামাদ মণ্ডলের ভাষ্যে তুলে ধরেছেন–

> "সমাজ জীবনে যুদ্ধের পর থেকে যে অর্থনৈতিক দুষ্ট কীট প্রবেশ করেছে, তাকে যেন আর ওষুধ দিয়ে সারানো যাবে না...। এ যে কী অনাসৃষ্টি, তা পাড়াগাঁয়ে ক'দিন বাস না করলে বুঝবার উপায় নাই। শোষণে, শাসনে আর দুর্নীতির অমানুষিক চাপে সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে।"[২১]

ছামাদ মণ্ডল যাকে 'অর্থনৈতিক দুষ্ট কীট' বলছে, তা আসলে পদ্মা তীরবর্তী নবীনগর, কামারহাট প্রভৃতি গ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা। 'মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ন্যুব্জ' হওয়া গ্রামের এসব মানুষ মূলত কৃষিজীবী। আবার এমনও ব্যক্তি গ্রামে দেখা যায়, যাদের প্রচণ্ড ক্ষমতার কাছে এসব মানুষের জীবন তুচ্ছ। যুদ্ধ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক আলোড়নের পথ ধরে গ্রাম-সমাজে যে 'অনাসৃষ্টি'র সূচনা, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী মানুষের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে; ক্ষমতাবান শ্রেণীর অবস্থান থেকে যায় অপরিবর্তিত। উপন্যাসের কালগত পটভূমি মোটামুটিভাবে পঞ্চাশ-দশকের গোড়ার দিকে।

উপন্যাসে কাহিনীর আবর্তন তিনটি পরিবারকে ঘিরে– মীর, মণ্ডল ও বৈরাগী পরিবার। ভূসম্পত্তির মালিকানার সূত্রে মীর-পরিবার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম-সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে; মণ্ডল-পরিবার কুসিদজীবী-ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং বৈরাগীদের অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি। মীর-পরিবারের প্রধান পুরুষ মীর খোরশেদ আলী পীর 'দুই দুইবার মক্কা শরীফ' ঘুরে এসেছে। 'দোয়া-দরূদ আর কলমা-নামাজ' এসব তার ধর্মপ্রবণতার লক্ষণ। 'দেশের লোকের চাহিদা'য় সে লাভ করে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের পদ এবং গ্রামের 'সালিস-বিচারের' ভার তার ওপর ন্যস্ত। ক্ষমতাসীন মীর খোরশেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেনে চলতে হয় সবাইকে। এর ব্যত্যয় হলে সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসে বিপর্যয়। জোনাব মণ্ডলের ছেলে গান-পাগল মেহের বয়াতীর নরোত্তম বৈরাগীর বাড়ি যাতায়াত মীরের কাছে অত্যন্ত কলংকজনক ব্যাপার; সেটা হয়ে যায় 'কওমের বদনাম'। নরোত্তমের কন্যা সরলার সঙ্গে মেহেরের নাম জড়িয়ে সে মেহেরকে হেয় করার চেষ্টা করে, যাতে গ্রামের লোক তাকে দুশ্চরিত্র বলে ধরে নেয়। মেহেরের গান-বাজনাকে ধর্মবিরোধী বলে অভিহিত করে তার গর্হিত কাজের প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ জারি করে মীর খোরশেদ। প্রায়শ্চিত্তের উপায় কিছু অর্থ জরিমানা এবং 'আল্লার নিকট... কান্নাকাটি'। মীরের মুখে উচ্চারিত 'হাদিসের কথা', 'শরা-শরিয়ত-ফতোয়া'র প্রতিবাদ করার সাহস নেই গ্রামের বিত্তহীন-ক্ষমতাশূন্য মানুষের।

মীরের ধর্মকেই যে গ্রামবাসীদের ভয় তা নয়; থানা-পুলিশের সঙ্গে মীরের যোগসাজশকেও তারা ভীতির চোখে দেখে। থানা-পুলিশের প্রকৃত কাজ যা-ই থাকুক, সমাজের চোখে তাদের ভূমিকা নেতিবাচক -----

> "দারোগা-পুলিশের কাছে মারামারি খুনাখুনির খবর বড় খুশির খবর, দুটো কাঁচা পয়সার খবর।"[২২]

"দারোগা বাবুরা ওদেরি কথায় কাম কাজ করে"– গ্রামের লোকদের ধারণা, থানা-পুলিশের কাজ সমাজের বিত্তবান-ক্ষমতাবানদের স্বার্থ-সংরক্ষণ করা। লোকদের এ ধারণা যে অমূলক নয়, নবীনগর গ্রামের মেহের বয়াতীর মামলা থেকে সেটা স্পষ্ট। সরলার আকর্ষণ এবং সংগীতোন্মুখতা থেকে মেহেরকে নিবৃত্ত করতে না পেরে নারীলিপ্সু মীর বেছে নেয় ষড়যন্ত্রের পথ। মীরের অপবাদ থেকে বাঁচতে আত্মমর্যাদা-সচেতন নরোত্তম সরলার জন্য বিয়ের পাত্র ঠিক করে ভিন্ন এক গ্রামের কুন্তল বৈরাগীকে। কুন্তলকে খুন করিয়ে মেহেরকে মিথ্যে মামলার ফাঁদে জড়ায় মীর খোরশেদ। মীরের সাজানো মামলায় থানার দারোগা অর্থের লোভে 'মামলা আসামী'দের খালাস দেয়; সাক্ষী-সাবুদ তৈরি করে মামলা সাজাবার উপায় বাতলে দেয় মীর খোরশেদকে।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই শুধু মেহের বয়াতীর মামলাই নয়, নবীনগর গ্রামের আরো বহু অসহায় মানুষের দুর্গতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মামলার অন্যতম সাক্ষী কেরামতের কথায় সেই দুঃসহ অবস্থার চিত্র–

> "এই তো হুজুর মেহের গেল মিছা খুনির দায়, ছবেদ শেখ হুজুর, বেচারা বড় গরিব আমার মতই, সে গেল বছর মিছা চুরির দায়ে জেলে গেছে।"[২৩]

কিন্তু এ অবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ নিরুপায়। ক্ষমতাবান শ্রেণীর অন্যায় আচরণকে মেনে নিয়েই তারা গ্রামে বসবাস করে। ষড়যন্ত্রকারী মীরের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেয়ার প্রেরণা তাদের দেয়নি সামজ। তাদের কণ্ঠে ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি–

> "না বাপু, ও পীর সাহেবের মতের বিরুদ্ধি কোর্টে গিয়া দাঁড়াতি পারবো না।"[২৪]

আদালতে প্রবল জেরার মুখে কুন্তল হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী এবং হত্যাকারী কেরামতের সাক্ষ্যে উন্মোচিত হয় ষড়যন্ত্রকারী মীর খোরশেদের স্বরূপ। পাশাপাশি গ্রামের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি কেরামতের অবস্থায় প্রতিফলিত সংখ্যাগরিষ্ঠের অক্ষম জীবনের বেদনা–

> "আমি নিজের ইচ্ছায় এসব করি নাই, যা কিছু করছি সব-ই ঐ প্রিসিডিন্ট সাহেবের হুকুমে। তা না করলি দারোগা-পুলিশের সাথে ওনার যা খাতির– কথা নাই বার্তা নাই, অবাধ্য হইছ কি দিবি এক চুরির কেসে ফাঁসায়া। যাও খাটে আস ছয় মাস, বচ্ছর। কী করবো হুজুর, গরিব মানুষ, জেলের বাইরে থাকতি হলি ওনার হুকুম তালিম করতিই হবি।"[২৫]

এমনি করেই 'আদিগন্ত' উপন্যাসে দেখা যায়, মানুষের অস্তিত্ব সংকট ও সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে জনগোষ্ঠী। ছামাদ পাণ্ডিত, মেহের, সরলা, শহরে বসবাসকারী আইনজীবী বাদশা মিয়া হাসান শোষিত জনগণের পক্ষ অবলম্বন করে। অন্যদিকে ভণ্ডপীর, ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট মীর খোরশেদ আলী ও লম্পট দারোগা লস্কর আলী তালুকদার অত্যাচারী শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সারদা নরোত্তমের আশ্রয়ে লালিত পিতৃমাতৃহারা সরলার প্রতি রিরংসায় মীর খোরশেদ প্রেমিক মেহের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিথ্যা খুনের মামলার আসামী করে মেহেরকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। আদালত কক্ষে বিচারকের এজলাসে মেহেরের প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ–

> "ধর্মাবতার, কোনকিছু বলে এ শাস্তির প্রতিকার হয় না, যেদিন আমার মত লোকেরা জোট বাঁধবে, সেদিন-ই এর প্রতিশোধ হাড়-মাংস দিয়ে দিতে হবে।"[২৬]

মেহেরের প্রতি ছামাদের অনুপ্রেরণা–

> "গানের কথায় মানুষকে শিক্ষা দিয়ে যাবি, মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে শেখাবি। বিদ্যে-বুদ্ধি হোক মানুষের, চোখ মেলে চেয়ে দেখুক নিজের অবস্থা, তাহলেই সব হবে। ... নইলে দেশ জাগবে না।"[২৭]

মেহের এবং ছামাদের বক্তব্যে প্রচারিত গণমুখী চিন্তা নিঃসন্দেহে সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষের প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রেণীচেতনার পরিচয় তুলে ধরে।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে দেখা যায়, সদ্য কারামুক্ত ছামাদ পণ্ডিত ও আইনজীবী বাদশা মিয়ার সহায়তায় মেহের জেল জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে। এবং এক রোমান্টিক মীমাংসায় উপন্যাসের সমগ্র শ্রেণীদ্বন্দ্ব

Dhaka University Institutional Repository

মুখ থুবড়ে পড়ে। যদিও উপন্যাসের সর্বত্র শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীচেতনা সক্রিয় ছিল। যেমন আইনজীবী বাদশা মিয়ার নাগরিক মনে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে উচ্চারিত আশাবাদে সেই পরিচয় প্রতিফলিত।

> "একথা ভুললে চলবে কেন যে, অনাচার-অত্যাচার যারা করে তারা একজাত; আমরা একজাত। এ অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ, সেটা সত্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবেই।"[২৮]

কিন্তু 'আদিগন্ত' উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের শ্রেণীবৈষম্যের রূপায়ণ থাকলেও এতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ ঔপন্যাসিকের গভীর জীবনবোধের আশ্রয় লাভে ব্যর্থ হয়েছে। কেবল শোষক-শোষিতের দু'টি স্পষ্ট পক্ষ চিহ্নিতকরণ এবং কিছু কিছু বক্তব্য-প্রচারণায় সীমাবদ্ধ থেকে গেছে লেখকের শ্রেণী-চেতনা। আহমদ কবির যথার্থই লিখেছেন–

> "সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর পক্ষপাতও সুস্পষ্ট, যদিও একথা সত্য, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও সমস্যা তাঁর রচনায় বুদ্ধিদীপ্ত যৌক্তিক বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাত হয়নি। সমাজ-অসঙ্গতি ও বৈষম্যকে তিনি বিচার-বুদ্ধি দিয়ে পর্যালোচনাও করেননি। অনেকটা আবেগী ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি মানুষের শোষণ মুক্তির কামনা করেছেন। সে জন্য ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত দরিদ্র জনতার জয় সূচিত হবে– এ ধরনের স্বপ্নিল ভাব-কল্পনায় তিনি ছিলেন মুক্তকণ্ঠ।"[২৯]

তা সত্ত্বেও বলা যায়, সরদার জয়েন উদ্‌দীনের সৃষ্ট চরিত্রগুলো সমাজের উচ্চবর্গীয়দের নিয়ন্ত্রিত বৃত্তে মলিন জীবনের মধ্যেও চেতনার উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত। নিম্ন স্তরের মানুষ হয়েও তারা দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে প্রসন্ন ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে।

সরদার জয়েন উদ্‌দীনের 'অনেক সূর্যের আশা' উপন্যাস জীবনের সুবৃহৎ আয়তন-কল্পনায় বিশিষ্ট। উত্তম পুরুষে রচিত এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের ভাববাদী জীবনচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এ উপন্যাসের কাহিনী বিস্তৃত। উল্লিখিত সময়কালের অসংখ্য ঘটনা– বিশ্বযুদ্ধ, সামাজিক অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ, দেশ বিভাগ-উত্তর বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবি রহমতের স্মৃতিকথনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। উপকরণ নির্বাচনের দিক থেকে সংশপ্তক উপন্যাসের সঙ্গে 'অনেক সূর্যের আশা'-এর সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সারের বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি এবং সমাজ রূপান্তরের স্বরূপনির্দেশনা এ উপন্যাসে অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-আক্রান্ত বাঙালি জীবনের সামগ্রিক ভাঙা-গাড়ার কাহিনীই এ উপন্যাসের প্রধান প্রবাহ। উপন্যাসে কাহিনীর উন্মোচন ঘটেছে দেশ বিভাগোত্তর ঢাকার পটভূমিকায়। স্বপ্নের ভূখণ্ড পাকিস্তান সৃষ্টির পরে পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক হায়াত খাঁ টঙ্গী জুট মিলে শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ কালে পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। অনেক সূর্যের প্রত্যাশায় লালিত ভূখণ্ডের এই ট্রাজিক স্বরূপ নির্দেশের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সূচনা। 'ভূমিকা'য় ঔপন্যাসিক যে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন, তাতে আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজজিজ্ঞাসা ও শিল্পপ্রেরণার সমন্বয় ঘটেছে।

> "ইউরোপীয় স্বার্থের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে'র লেলিহান অগ্নিশিখায় এশিয়ার অসংখ্য প্রাণ হয়েছিল খড়কুটোর মতো ভস্মীভূত এবং যুদ্ধ-সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মানবাত্মাকে নিক্ষেপ করেছিল চরম বিপর্যয়ের মুখে। এর ফলে এক মুঠো খাদ্যের জন্য মানুষ বিসর্জন দিয়েছিল তাদের সম্ভ্রম, নীতি-ধর্ম। সে-সব দিনের অনেক চাক্ষুস ঘটনা দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে;

Dhaka University Institutional Repository

> সেগুলো আঘাত করেছে আমার মানসপটে হৃদয়ে। এ উপন্যাস সেসব মনোবেদনারই জীবন্ত চেতনা বা ভাষারূপ।"[৩০]

> "ঔপন্যাসিকের এই আত্ম-অভিজ্ঞতা কবি রহমতের স্মৃতিকথনের মধ্যদিয়ে অনেক সূর্যের আশায় শব্দরূপ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক বিস্তৃত ক্যানভাসে অংকন করেছেন 'যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মানুষের নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট, মানুষের জীবন যুদ্ধের বহুভুজ চিত্র।"[৩১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় উপমহাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তার বাস্তবায়ন ঘটে। বাঙালি মুসলমানদের আত্যন্তিক স্বপ্নকল্পনা ও বস্তুসম্পর্ক বিরহিত ভাবাবেগ পাকিস্তান আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সাম্রাজ্যবাদ ও তার এ দেশীয় অনুচরদের সক্রিয় ষড়যন্ত্রও এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। সেই বিষবৃক্ষের বিষফল ফলতে শুরু করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই। হায়াত খাঁর মতো শ্রেণীসচেতন রাজনৈতিক কর্মীও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল অনেক সূর্যের প্রত্যাশায়। কিন্তু স্বশ্রেণীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় নব্য-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে তার মর্মন্তুদ মৃত্যু ঘটে। উপন্যাসের সূচনায় ঔপন্যাসিক এই স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডিকে সুকৌশলে উপস্থাপন করেছেন। ট্রাজিক বেদনার এই শূন্যতার অনুষঙ্গে অতীতের অসংখ্য চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। কবি রহমত, হায়াত খাঁ, ছমির মিয়া, সাজাহান চৌধুরী, কবি নিজাম, কমলকুমার রায়, হেনার মা, লুসি সাইপ্রিন, মিস রডারিক, কাজী গিয়াসুদ্দিন, আবদুল হামিদ, ফজলুল করিম, পান্ডে জী, মিঃ গাঙ্গুলী, সুলতান মিয়া, জামরুল, ভীমরুল প্রমুখ চরিত্রের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসা ও জীবনযন্ত্রণা যুদ্ধ-আক্রান্ত সময় ও সমাজের পটে উন্মোচিত হয়েছে। ঘটনা ও ক্রিয়ার কার্যকারণ-শৃঙ্খলা সর্বত্র রক্ষিত না হলেও একটা বিপর্যস্ত কালের অন্তর-বাইরের সমগ্রতা বিধৃত হয়েছে এ উপন্যাসে। যুদ্ধকালীন কলকাতার বেকারত্ব, দুর্নীতি, মেসে দুর্বিসহ অনিকেত জীবন, দুর্ভিক্ষ ও হতাশায় বেকার যুবসম্প্রদায় এই অন্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়। একমাত্র ডক-শ্রমিক হায়াত খাঁ ছাড়া এই মানবতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী যুদ্ধের স্বরূপ অনুধাবনে অনেকেই ব্যর্থ হয়। নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ভবিষ্যৎ-অন্ধ যুবসম্প্রদায়কে স্থূল ভোগের স্রোতে নিক্ষেপ করে। সমাজদেহ ও মানবদেহ হয় পক্ষাঘাত ও সিফিলিসের মত জটিল রোগে আক্রান্ত। অস্থির ও বিকারগ্রস্ত সমাজ পটভূমিতে ভালবাসা অন্তর্হিত হয়ে 'ভোগ লালসার কারসাজি'তে পরিণত হয়। ব্লাক মার্কেটের প্রসার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকেও করে তোলে কতিপয় সুবিধাভোগী লুটেরা শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণভুক্ত। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া আবহমান গ্রামজীবনের শান্ত রূপকেও বিশৃঙ্খল করে তোলে। খাদ্য ও জীবিকা সন্ধানী মানুষেরা শহরের রাজপথে মান-সম্ভ্রম-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সবদিক দিয়েই ছিন্নমূল হয়ে পড়ে।

যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এ উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মতৎপরতার ও ব্যর্থতা, জার্মান-জাপান-ইটালির ফ্যাসিস্ট শক্তির পতন, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মতৎপরতা, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রসঙ্গ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে বৈচিত্র্যময় ও গতিশীল করেছে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখবো :

> "সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পূর্ব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠছে, ঝলমল করে রেঙে উঠছে দিগন্ত!..ঐ ওখানে আলোর পারে সে দেশ– স্বপ্নের দেশ..। যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, নেই অভুক্ত জনমানব। গরিব-কাঙ্গাল, রাজা-জমিদার সব সেখানে সমান, সব একই মানুষ।"[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই শোষণহীন শ্রেণী বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে আলোচ্য উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার সদর্থক ভূমিকার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১)

বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় যে ক'জন ঔপন্যাসিক সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বৈপ্লবিক অঙ্গীকারকে শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার অন্যতম। আর এ কারণে প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রেণীচেতনার পরিচয় তাঁর উপন্যাসে বর্তমান। 'সারেং বৌ' (১৯৬২) ও 'সংশপ্তক' (১৯৬৬)– এ দু'টি উপন্যাসের মধ্যে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।

'সারেং বৌ' (১৯৬২) রাষ্ট্রীয়-সামাজিক আলোড়ন থেকে দূরে এক নিভৃত গ্রামে শোষকশ্রেণীর নিপীড়ন-নির্যাতনের মধ্যে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার কাহিনী। উপন্যাসে সমুদ্র উপকূলীয় গ্রামের জীবনযাত্রা স্থান পেলেও বৃহত্তর অর্থে তা পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনেরই মর্মকথা। 'সংশপ্তক'-এ চিত্রিত ঔপনিবেশিককালে লেকু, কসির প্রভৃতি নিম্নবিত্ত মানুষ আবাসস্থল গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে জীবিকার খোঁজে! সেই অন্বেষণ থেমে পড়েনি; স্বাধীন দেশেও তা অব্যাহত। 'সারেং বৌ'-এ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় গ্রামের কদম তেমনি এক যুবক। জীবিকার সংগ্রামে যাকে শুধু গ্রাম নয়, দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় বিদেশে। কিন্তু কদমের জীবন-সংগ্রাম মূল বিষয় নয় উপন্যাসে। গ্রাম ছেড়ে কদমের বেরিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে গ্রামেই সূচিত হয় আরেক জীবনের সংগ্রাম। বিদেশে কদমের দীর্ঘ কারাবাসজনিত অনুপস্থিতিতে কদমের স্ত্রী নবিতুনের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার প্রয়োজন পড়ে জীবিকার তাগিদে। অন্তঃপুর থেকে বাইরে বেরিয়েই নবিতুন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে এক কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে। নবিতুনের ঘর-বাইরে দূরত্ব আক্ষরিক অর্থে কিছু নয়। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা বহন করে বিরাট তাৎপর্য। জীবিকার সন্ধানে বাইরে বেরিয়েই সে সমাজের শোষকশ্রেণীর মানুষগুলোর প্রকৃত চেহারা কাছ থেকে দেখতে পেল। নবিতুনের বাইরে বেরোনোর আগেও গ্রাম-সমাজে শোষণ ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে নবিতুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যোগ ছিল না। উপকূলীয় জীবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে টিকে থাকা সহায়-সম্বলহীন মানুষের জন্য নিদারুণ কষ্টকর। ঝড়-সাইক্লোন-বন্যার চাইতেও যে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে মানুষ, নিজের অস্তিত্বের সংগ্রামশীলতা দিয়ে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে নবিতুন। নবিতুনের অসহায়ত্বের মূল কারণ বামনছড়ি গ্রামের উঠতি ধনিক শ্রেণীর বিকৃত প্রতিচ্ছবি লুন্দর শেখ। তার ষড়যন্ত্রেই স্বামী প্রদত্ত টাকা ও চিঠি থেকে বঞ্চিত হয় নবিতুন। ফলে আরোপিত দারিদ্র্য নবিতুনের অস্তিত্বকে সীমাহীন অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নবিতুনের অসহায়তার কথা দুর্বৃত্ত লুন্দর শেখ সামান্যতম বিবেচনায় আনেনি। নিষ্ঠুরতা-হিংস্রতার প্রতিমূর্তি জমিদার লুন্দরের কাছে নবিতুন অতি তুচ্ছ বস্তুর ন্যায়। নগদ অর্থ, সম্পত্তি, সংসারের আরাম-আয়েশ ইত্যাদি নানা প্রলোভনের বিনিময়ে তাকে করতলগত করতে চেয়েছে সে। গ্রাম্য রমণী নবিতুনের করুণ কাহিনীর মধ্যে পূর্ববঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে, যারা সমস্ত প্রত্যাশা-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তৎপরতায় অহর্নিশ ব্যস্ত, যে সমাজে মানবিকতার বোধ হারিয়ে ক্ষমতাদর্পী মানুষ ক্রমশ 'জানোয়ার' হয়ে ওঠে; সেখানে প্রয়োজন প্রতিরোধ-চেতনার। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় থেকেও নবিতুন সেই কাজটাই করে গেছে শেষ পর্যন্ত। সে লুন্দরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কন্যা

Dhaka University Institutional Repository

আক্‌কি'র মারফত পাঠানো লুন্দরের টাকা ছুঁড়ে দিয়ে এসেছে তার সামনে। নির্জনে ধর্ষণোদ্যত লুন্দরকে প্রতিরোধ করেছে শারীরিক শক্তি দিয়ে।

উপন্যাসের শেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে চরাচরব্যাপী শূন্যতার প্রেক্ষাপটেও ঔপন্যাসিক সম্ভাবনার উৎস খুঁজে পান নবিতুনের মধ্যেই। ক্ষুৎপিপাসা-কাতর মুমূর্ষু কদমকে সে বাঁচিয়ে তোলে অপূর্ব প্রাণের স্পর্শে। নবিতুনের অজেয় প্রাণশক্তি তাকে অন্তিম পর্যন্ত উজ্জীবিত করে রাখে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের শ্রেণী নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা আর দারিদ্র্য পরতের পর পরত উন্মোচিত হয়েছে নবিতুনকে ঘিরে। সাধারণ গ্রাম্য-রমণী নবীতুনই শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিকের শ্রেণীসচেতন আশাবাদী জীবন-দর্শনের প্রেরণা। সমস্ত বিপর্যয়ের ভেতরেও সে বেঁচে থাকে জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

'সারেং বৌ' উপন্যাসে প্রতিফলিত শ্রেণীচেতনা সংগঠিত শ্রেণীসংগ্রামে রূপান্তরিত না হলেও নবিতুন চরিত্রের অজেয় সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়ে শ্রেণীচেতনার আশাবাদী প্রত্যয়কে জাগিয়ে তোলে। আসলে যে প্রাণশক্তি গ্রাম্য সমাজে অবলা বলে কথিত নারীর মধ্যে দুর্মর হয়ে থাকতে পারে, তা সমাজের বিপুলসংখ্যক শোষিত মানুষের মধ্যেও থাকা সম্ভব। 'নবিতুন' সেই শোষিত মানুষদেরই একজন। কিন্তু লুন্দর শেখের মত নিপীড়কদের সঙ্গে লড়বার পক্ষে একা নবিতুন কিংবা কদম-নবিতুন একসঙ্গেও যথেষ্ট নয়। সমগ্র জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতার ফলেই তা সম্ভব হতে পারে। শ্রেণীসংগ্রামের সেই সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত না থাকলেও সারেং পরিবারের এক রমণীর জীবনযুদ্ধে যোদ্ধা হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে এ উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে।

শহীদুল্লা কায়সারের অপর উপন্যাস 'সংশপ্তক' (১৯৬৫)। শ্রেণীচেতনাপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বৈপ্লবিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে 'সংশপ্তক' উপন্যাসে। জীবনাদর্শ ও শিল্পনির্মিতি উভয় মানদণ্ডেই 'সংশপ্তক' বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক অসামান্য সংযোজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকাল থেকে শুরু করে বিভগোত্তর কাল পর্যন্ত প্রায় এক যুগের বাঙালির জীবনসত্য এ উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মুক্তিচেতনা ঔপন্যাসিকের জীবনাদর্শের মৌল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৩৮-১৯৫১ সময়পটে বিধৃত কাহিনীর মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে এক যুগান্তরের ইতিকথা। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানকল্পে উপমহাদেশে যে মুক্তিসংগ্রাম চলছিল, তার দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার জটিল প্রশ্নের উদ্ভব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধাবসান ও কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগের পর মুক্তিসংগ্রামের পালাবদল এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সূচনা– এই কয়েকটি পর্বের পটভূমিতে বাংলাদেশের দু'টি গ্রামের চরিত-কথা 'সংশপ্তক' উপন্যাসে উন্মোচিত হয়েছে।[৩৩]

'সংশপ্তক' উপন্যাসে কলকাতা-ঢাকার নাগরিক পরিবেশের এবং বাকুলিয়া, তালতলি নামক পারস্পর সংলগ্ন দু'টি গ্রামের বাস্তব চিত্রের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক প্রতিবেশটাকেই সামনে আনা হয়েছে। তবে নগরজীবন অপেক্ষা গ্রাম্যজীবনের বাস্তবতা রূপায়ণে লেখক আলোচ্য উপন্যাসে অধিকতর সফল হয়েছেন। জাহেদ, রাবু, মালু, লেকু, হুরমতি প্রমুখ চরিত্র গ্রাম ও নগরজীবনের যোগসূত্র গড়ে তুলেছে।

হিন্দুপ্রধান তালতলি গ্রামে আধুনিক শিক্ষার প্রসার লক্ষ করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রেও তালতলি গ্রাম অগ্রসর। অপরদিকে, পরাধীন ভারতবর্ষে প্রবল পরাক্রমশালী সামন্ত জমিদার শ্রেণী কর্তৃক শাসিত বাকুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামের কাহিনীকে আশ্রয় করে প্রায় দেড় যুগের পরিসরে পূর্ববঙ্গের গ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের ক্রমবিবর্তনের চিত্র আলোচ্য উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। বাকুলিয়া গ্রামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দেড়শ' বছর পরেও বৃটিশ সৃষ্ট জমিদার-শ্রেণীর উত্তরসূরীরাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। গ্রাম-সমাজে প্রচলিত 'পঞ্চায়েৎ' বা 'মজলিস' ব্যবস্থার তারা কর্ণধার। পাশাপাশি রয়েছে ধর্ম ও 'শরিয়ত' এবং ধর্ম-শরিয়তের ব্যাখ্যাকারী 'খতিব' ও 'ক্বারী'। কোরান-হাদিসের 'মশুর ওস্তাদ' 'মসজিদের খতিবে'র মুখনিঃসৃত বাক্য 'কোরানের বয়ানের মতোই অভ্রান্ত, অবশ্য পালনীয়'। 'হাফিজ-ই-কোরান' 'ক্বারী সাহেব' 'শরা-শরিয়ত' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ও ধর্ম-শরিয়তের বিধান হল, যাতে নারীরা সর্বদা 'ঘোমটা' রাখে মাথায়, অন্তঃপুরে থাকে এবং এমন স্বরে কথা বলে, যাতে বাড়ির পুরুষরাও শুনতে না পায়। গ্রাম-মধ্যে সংঘটিত অন্যায়ের শাস্তি-বিধানকারী থানা-পুলিশ নয়, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ। শাস্তি হিসেবে রয়েছে 'দোররা', 'পাথর ছুঁড়ে মারা', ধাতব মুদ্রা পুড়িয়ে কপালে 'ছেঁকা দেয়া' ইত্যাদি। সব ধরনের দণ্ডের রায় ঘোষণার প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি গ্রামের জমিদার।

যে জমিদার শ্রেণী ভারতবর্ষে উদ্ভূত ও লালিত হয়েছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং মোগল আমলের যারা ছিল ক্ষমতা-কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে, তাদের আভিজাত্যবোধ-অহংকারের ধারক-বাহক আলোচ্য উপন্যাসের বাকুলিয়া গ্রামের 'মিঞা বাড়ি'র জমিদার। অতীত গৌরবের মোহে অন্ধ জমিদার ফেলু মিঞা। প্রজা তথা কৃষিজীবী মানুষ তার কাছে 'ছোট লোকের জাত'। মিঞারা ভূমির কর্তৃত্বের সুযোগে কঠোর হস্তে প্রজা-শাসন চালিয়ে গেছে যুগ পরম্পরায়। গ্রামের কৃষিজীবী নিম্নবর্গ আত্যন্তিকভাবে ভূমি-নির্ভর , কিন্তু তাদের চাষকৃত জমির প্রকৃত মালিক জমিদার। দরিদ্র গ্রামবাসীদের স্বীকারোক্তিতে সে সত্য প্রকাশিত :

> "আপনি খাওয়ালে পর গরিব বাঁচে, না খাওয়ালে গরিব মরে। আপনি আছেন বলেই তো গ্রামটা টিকে আছে।"[৩৪]

'গরিব' হচ্ছে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ, যাদের অধিকাংশ ভূমিহীন কিংবা স্বল্পভূমির অধিকারী; তাদের ভূমি 'হাতের তালুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করা'। বেঁচে থাকার জন্য তারা 'বর্গা খাটে'– জমিদারের জমিতে; ফলে তারা জমিদারের প্রজা। আর জমিদার মিঞার বেটার কাছে তাদের পরিচয় ছোট লোক, কাঙালের জাত, ভিক্ষুকের জাত হিসেবে।

গ্রামীণ সমাজের জমিদার-শ্রেণীর সঙ্গে ক্ষমতা-কর্তৃত্বের অংশীদার মহাজনশ্রেণী। জমিদারের ক্ষমতার উৎস যেখানে প্রধানত ভূমি, মহাজনের সেখানে ভূমি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য নগদ অর্থের মূলধনে চলে তাদের 'সুদী কারবার, তেজারতি, চায' এবং 'ধান চাল-মশলার পাইকারি করবার'। ক্ষেত্রবিশেষে ভৌত সম্পত্তির মালিক জমিদারের চাইতেও ক্ষমতাশালী বাণিজ্যলব্ধ নগদ অর্থের মালিক মহাজন। জমিদার-মহাজন উভয়ের প্রভাব নিম্নবর্গ জীবনে একই। ভূমি এবং অর্থের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উভয়ের দ্বারস্থ। দেনা-খাজনার দায়ে কৃষক বন্ধকী জমি হারায় জমিদার-মহাজনের কাছে। আবার, জমিদারের দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে কৃষক মহাজনের ঋণের ওপর নির্ভরশীল। মহাজনের অর্থ যথাসময়ে ফেরত দিতে অক্ষম কৃষকের দেনা বাড়ে চক্রবৃদ্ধি হারে; শেষ পর্যন্ত তার পরিচয় দাঁড়ায় নিঃস্ব-ভূমিহীন, দিনমজুর কিংবা গ্রামত্যাগী। জমিদার-মহাজন ব্যতিরেকে রয়েছে মধ্যস্বত্বভোগী, যার অবস্থান জমিদার এবং সাধারণ কৃষকের মধ্যবর্তী রূপে। এ শ্রেণীর প্রতিনিধি রমযান। সে জমিদার ফেলু মিঞার কর্মচারী; তার কাজ জমির মালিক এবং প্রজাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা– "চাষী আর মিঞার মাঝে রমজান হল গিয়ে এক সেতু।" এ সুবিধাজনক অবস্থানকে সে কাজে লাগায় নিজের স্বার্থোদ্ধারে। অন্যায়, জুলুম, হয়রানির মাধ্যমে প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে অতিরিক্ত অর্থ; প্রজারা তার ভয়ে প্রতি মুহূর্তে সন্ত্রস্ত। প্রজা পীড়নকারী ভূমিকার কারণে সে

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারের প্রীতিভাজন। ভূমির প্রকৃত মালিক জমিদার হলেও প্রজার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। সেক্ষেত্রে সার্বিক তত্ত্বাবধানকারী তার বেতনভোগী কর্মচারী রমজান। ফলে বাকুলিয়া গ্রামে অলিখিতভাবে জমির মালিকের চেয়েও ক্ষমতাবান মধ্যস্বত্বভোগী। কালক্রমে সে মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে পৌঁছায় ভূম্যধিকারীর পর্যায়ে। 'মিঞা বাড়ির নায়েবি' করে সে অর্জন করে 'সাত কানি জমি' ও 'পুকুরে অঢেল মাছ'। জমিদারের অজ্ঞাতে সে নিয়োজিত গোপন 'সুদী কারবারে'। যখন যেভাবে সুবিধা, রমজান তার অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে লাভ করেছে অর্থ-সম্পত্তি। জমিদার-মহাজন মধ্যস্বত্বভোগী– এ তিন শ্রেণীর শোষণের সবটা চাপ পড়েছে কৃষিজীবী নিম্নবিত্তের ওপর।

বাকুলিয়া গ্রামের নিম্নজীবী মানুষের প্রতিফলন ঘটেছে লেকু, আম্বরি, কসির, হুরমতি, সেকন্দর প্রভৃতির মধ্যে। কৃষক লেকুর পিতা ছিল 'নাম করা কামলা'। লেকু উত্তরাধিকার সূত্রে যে, 'ছয় গন্ডা' জমি লাভ করে, তা 'বন্ধকি' জমি। কার্যত সেই জমির মালিক, কিন্তু বাস্তবে তা জমিদারের হস্তাগত। দৈহিক পরিশ্রমে অর্জিত অর্থে পিতার ঋণবন্ধকী জমি লেকু ফিরিয়ে আনে নিজের কাছে এবং কেনে আরো আট গণ্ডা জমি। জমিটুকু ছাড়া আর রয়েছে 'ভিটি'; ভিটের চারপাশে 'কয়েক গণ্ডা গুপুরি গাছ, গোটা চার আম গাছ, একটা জাম গাছ'। সামান্য জমি, নিজের ও তার স্ত্রীর শারীরিক শ্রম-নির্ভর আয়ে লেকুর পাঁচ মাসের ব্যয় নির্বাহ হয়। বাকি সাত মাসের 'খোরাকের জন্য' সে চেষ্টা চালায় নানাভাবে।

লেকুর বিশ্বাস, সে দৈহিক শ্রমে অর্জিত অর্থে ফিরিয়ে আনবে বন্ধকী জমি। প্রয়োজনে সে যাবে পাহাড়ি অঞ্চলে কিংবা বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন। কার্যত লেকু সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে যায় কাজের খোঁজে। কৃষক লেকুর নতুন পরিচয় দাঁড়ায় দিনমজুর রিকশাচালক। তার স্ত্রী আম্বরি অনাহার-অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করে 'কাঠির মত শীর্ণ' শরীর নিয়ে। লেকু ছাড়াও জমির খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ কসির 'বাপ-দাদার' ভিটে ছেড়ে চলে যায় অজানার উদ্দেশ্যে। গ্রামত্যাগকারী কসিরের কণ্ঠে আশাবাদ, "মানুষ হয়ে লই, মানুষ হয়ে আবার ফিরে আসবো।" কসিরের 'মানুষ' হওয়ার অর্থ বিত্তবান হওয়া, ভূমির মালিক হওয়া। বাস্তবে লেকু, কসির চিরস্থায়ীভাবে উৎখাত হয় তাদের ভিটেমাটি-জমিন থেকে।

এভাবে লেকু-কসিরের মত ভূমি হারানো কৃষিজীবীরা চিরস্থায়ীভাবে উৎখাত হয় তাদের ভিটেমাটি জমি থেকে। এদের কেউ কেউ কৃষিজীবী জীবন ছেড়ে লেকুর মত শহরে অদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়; কেউবা প্রতিবেশী দেশে পাড়ি জমায় শারীরিক শ্রমের ওপর নির্ভর করে বাঁচার প্রত্যাশায়। তাদের বেঁচে থাকার পথ অতি সংকীর্ণ। অল্প জমি, দারিদ্র্য, ঋণগ্রস্ততা লেকু-কসিরের মত বাংলাদেশের গ্রামের কৃষককে যুগ-পরস্পরায় প্রান্তিক অবস্থা থেকে একেবারে ভূমিহীনের কাতারে নিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি মহাজন-জমিদারের দখলে চলে যায় চিরদিনের জন্য। এভাবে বাংলাদেশের গ্রামে নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী মানুষদের জমি-হারানোর প্রক্রিয়া চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। 'সংশপ্তক' উপন্যাসে বাংলার গ্রামসমাজের এ বাস্তবতার প্রতিফলন লক্ষণীয়। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের প্রাক্কালে এসে ধারাবাহিক নিঃস্বতার শিকার গ্রামীণ নিম্নবিত্তের টিকে থাকার সমস্ত উপায় তাদের হাতছাড়া। তখনো গ্রামে উত্থান ঘটছে নতুন জমিদার-মহাজনের। নতুন চরিত্রে আবির্ভাব ঘটছে শোষণের। 'সংশপ্তক' উপন্যাসে ঐতিহ্যবাহী জমিদার ফেলু মিঞার পরিবর্তে গ্রাম-সমাজে আবির্ভাব ঘটে নব্য জমিদার রমজানের, যে কোনকালে সংশ্লিষ্ট ছিল না জমির মালিকানার সঙ্গে। অতীতে সে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন যায় ভাগ্যান্বেষণে এবং সেখান থেকে পালিয়ে আসে খুনের আসামী হয়ে। ফেলু মিঞার লেঠেল, নায়েব প্রভৃতি পেশায় থেকে সে চালায় প্রবল প্রজা-পীড়ন। পুরনো জমিদার ফেলু মিঞার কাছে প্রজা-শাসনের পাঠ নেয় ভাবি জমিদার রমজান। গোপন সুদ ব্যবসায়, কালোবাজারি, নারীপাচার ইত্যাদি অসৎ কারবারে গড়ে ওঠে তার অযুত সম্পদ। দেশ-বিভাগের পর রমজানের নতুন পরিচয় 'কাজি মোহাম্মদ রমজান'। হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারের রেখে যাওয়া ভূমি-সম্পত্তি দখল করে গ্রামে স্থায়ী প্রভাবের আসন নেয় সে। বাংলাদেশের গ্রাম-সমাজে রমজানের মত একজন দুর্বৃত্তের উত্থান ও বিকাশের মধ্য দিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজের একটা অবয়ব গড়ে ওঠে, যেখানে নিত্য অবমূল্যায়ন চলে মানুষের; যেখানে প্রতিনিয়ত শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শোষণ-নিষ্পেষণে পীড়িত কৃষিজীবী মানুষ।

অপরদিকে সংশপ্তক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র বাকুলিয়া গ্রামের সৈয়দ বাড়ির সন্তান আলীগড় শিক্ষিত জাহেদ পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রেই কলাকাতায় শিক্ষালাভ কালে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভক্ত হয়ে পড়ে এবং সামন্ত স্বার্থের প্রতিভূ এবং বিত্তহীনদের এক কাতারে শামিল করে মুসলিম লীগ গঠনে আত্মনিয়োগ করে ।

পরে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দাঙ্গা-বিরোধী ভূমিকায় এবং তারও পরে শ্রমিক-কর্মী হিসেবে সে আত্মপ্রকাশ করে। পাকিস্তান পরবর্তীকালে ঢাকায় শ্রমিক-রাজনীতিতে লিপ্ত থাকার জন্য তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে সে নতুনভাবে নিজ গ্রাম বাকুলিয়ায় ফিরে গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত ও বিত্তহীনদেরকে শ্রেণীসংগ্রামের পতাকাতলে সমবেত করতে সফল হয়। বাস্তবের অভিঘাতেই ধর্মীয়-স্বাতন্ত্র্যবাদী জাহেদ সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হয়। সে শ্রেণীত্যাগেও সফল হয়।

ফলে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের শ্যেণদৃষ্টি জাহেদের উপর নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরিণামে বাঙালি মুসলমানের 'স্বপ্নের ভূখণ্ড' পাকিস্তানের পুলিশ জাহেদকে গ্রেপ্তার করে।

উপন্যাসের কাহিনী পর্যবেক্ষণে আমরা দেখি, জাহেদের মনোভাবনা নিবেদিত সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনায় এবং তার সমাজচিন্তা ক্রমবিবর্তনের পথে সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শে উপনীত, যে জীবনাদর্শ আসলে ঔপন্যাসিকেরই। এমনকি আমরা দেখি, সমাজতান্ত্রিক দর্শনে বিশ্বাসী জাহেদ তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে সরকারি রোষানলে পড়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সময়েও এতটুকু হতাশ হয় না। বাকুলিয়ার গ্রামবাসীদের সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, "আবার আসবো আমি।"[৩৫]

এভাবেই শ্রেণীশোষণ ও নিপীড়ন থেকে নির্বিশেষ মানবমুক্তির প্রত্যয় ধ্বনিত হয়েছে উপন্যাসের অন্তিমে জাহেদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

উপন্যাসের অপর উল্লেখযোগ্য অন্যতম প্রধান চরিত্র শিক্ষিত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সেকান্দার মাস্টার চরিত্রটি। বাকুলিয়া তালতলি এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক জীবনধারাকে সত্যিকার স্বাধীনতা ও মুক্তির দিগন্তে পৌঁছে দেবার ব্রতে কৃষকসন্তান সেকান্দারের ভূমিকা ব্যতিক্রমী। শ্রেণীসচেতন সেকান্দর সবসময়ই চেয়েছে দেশব্যাপী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফলে মুক্তি আসুক–

> "রোদে যাদের ক্ষেত পোড়ে, ক্ষিধেয় যাদের পেট জ্বলে, অকাল মৃত্যু যাদের কপালের লিখন, তাদের মুক্তি।"[৩৬]

এভাবে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে শোষিতের জন্য সহানুভূতি সেকান্দরের সংস্কারমুক্ত শ্রেণীসচেতন উদারচিত্তের পরিচয় দান করে। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার অনুসারী জাহেদের সঙ্গে কথোপকথনে সেকান্দর মাস্টারের আত্মস্বরূপ সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

> "সহসা দু'হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের পথটা আগলে দাঁড়ায় জাহেদ, হাতের মুঠোতে চেপে ধরে ওর জামার গলাটা, তারপর তীরের মত ছুঁড়ে মারে প্রশ্নটা, বল, তুমি মুসলমান কিনা?
> হ্যাঁ।
> তবে তুমি কি?
> মানুষ।
> অপমানবোধে মুখটা লাল হয়ে আসে জাহেদের। তুমি কি বলতে চাও আমি মানুষ নই?
> না। তুমি মুসলমান।
> আলবৎ। আমি প্রথমে মুসলমান তারপর মানুষ।...
> ভুল করছ জাহেদ, ভুল করছ। প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়।"[৩৭]

উপন্যাসের মৌলপ্রবাহ সেকান্দর মাস্টারের অনুসৃত আদর্শের ধারায়ই যেন গতিশীল হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতির মাধ্যমে নানা পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেলেও সেকান্দর চরিত্রের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে বাঁচতে আগ্রহী হয়নি সে। সে শুধু অসাম্প্রদায়িকই নয়, শ্রেণীসচেতনও। সেকান্দরের চিন্তা-ভাবনা সুস্থ, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানভিত্তিক। তার দৃষ্টিতে স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ তাই কেবল ইংরেজ বিতাড়ন নয়। জাহেদের চিন্তার অসম্পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে সেকান্দরের উক্তিতে সে সত্যই প্রকাশ পেয়েছে :

> "... তোমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ শুধু ইংরেজ বিতাড়ন। আমার কাছে তার অর্থ আরো ব্যাপক, ইংরেজ বিতাড়ন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, জমি, রুটি-রুজি, জীবনের নিরাপত্তা।"[৩৮]

এ উপন্যাসের সত্যিকার সংশপ্তক যেন আর কেউ নয়, সেকান্দরই। সেকান্দর মাস্টারের মধ্যে যে শ্রেণী নিপীড়নমুক্ত বিপ্লবী গণচেতনার অংকুর তা ক্রমান্বয়ে রাবু, মালু প্রমুখের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণামে একটা সংঘবদ্ধ শ্রেণীচরিত্রে রূপ নেয়।

এভাবে 'সংশপ্তক' উপন্যাসে সমাজ এবং সময় চলমান ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। উপন্যাসটিতে কোন প্রকার স্থিতির ইঙ্গিত দিয়ে যতি টানেননি ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ সমর্থক জাহেদের প্রত্যাশা যেখানে ছিল দেশ ভাগের মধ্যেই ঘটবে সকল সার্থকতা; তাতেও জাহেদ স্থিতি খুঁজে পায়নি। অবশেষে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে সে দীক্ষা নিয়েছে সমাজতন্ত্রে।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতেও দেখা যায়, আরেক অনাগত জীবনপ্রবাহের আভাস। বাকুলিয়া গ্রামের মালু (মালেক), যার স্বপ্ন ছিল গায়ক হওয়ার, নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী শহরে মানুষের ওপরে ওঠার বিকারগ্রস্ততা দেখে সে ফিরে আসে গ্রামে। একদিন কিশোর বয়সে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মঞ্চে গেয়েছিল নজরুলের বিপ্লবী গান, সে দেখল তার আশা পূরণ হয়নি। সে নতুনভাবে প্রেরণা অর্জন করে জাহেদের কাছে। সৈয়দ বাড়ির অন্তঃপুরের মহিলা সদস্য রাবু যে পরাধীন ভারতেই পিতা–পরিবারশাসিত ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে, সেও এবার তার জ্ঞান-শিক্ষাকে কাজে লাগাতে চায় সমাজের শোষিত মানুষের জন্য কাজ করার মাধ্যমে। তার সামনেও আশার আলোকবর্তিকারূপী জাহেদ, জাহেদের রাজনীতিতে শরিক হয়ে সেও বামপন্থী চেতনার অধিকারী হয়েছে এবং আগ্রহভরে জাহেদের মানসসঙ্গিনী ও কর্মসঙ্গিনীতে পরিণত হয়েছে। রাবু আসলে নতুন যুগের নারী কিন্তু সে যুগ তখনো যেন

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিতির অপেক্ষায়। উপন্যাসের শেষে পুলিশ কর্তৃক সমাজতন্ত্রী নেতা জাহেদের গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু জাহেদ গোপনে রেখে যায় আরো অনেক সংগ্রামী কর্মী, যারা বিশ্বাস করে, সংগ্রামের কেবল শুরু হয়েছে। 'আমি আসব' প্রতিশ্রুতিতে জাহেদ তাদের ভবিষ্যত সংগ্রামের আশাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। এভাবেই সমাজ সময়ের প্রতিরূপে বামপন্থী আদর্শের অঙ্গীকার ও শ্রেণীচেতনা বিষয়টি 'সংশপ্তক' উপন্যাসে মহাকাব্যিক অবয়ব লাভ করেছে। মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণমানুষের মুক্তির বাণী শহীদুল্লা কায়সারের উক্ত উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৮)

আলোচ্য কালপর্বে শ্রেণীচেতনার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) এবং 'আলমনগরের উপকথা' (১৯৫৫) উপন্যাস দু'টিতে।

গ্রন্থ প্রকাশের ক্রম হিসেবে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম-ই বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার ঔপন্যাসিক। তাঁর 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) এবং 'আলমনগরের উপকথা' (১৯৫৫) উপন্যাস দু'টিতে বিষয়বস্তু ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সমাজ-ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ-অন্বেষায় রূপ নিয়েছে। এ সমাজান্বেষায় সর্বাধিক অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেন সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের সমাজতাত্ত্বিক জীবনদর্শন থেকে। দুটো উপন্যাসেই গ্রামীণ নিম্নবর্গের দুঃসহ বাস্তবতা গেঁথে উঠেছে অকৃত্রিম জীবন-দৃষ্টিতে। ঔপন্যাসিক কৃষিজীবী এবং সাধারণ সহায়-সম্বলহীন মানুষদের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেন; পাশাপাশি তাদের জন্য অন্তরে পোষণ করেন আশাবাদ। তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো ভবিতব্যের আশাবাদী স্বপ্নের লালনকারী। প্রবল হতাশার মধ্যেও তাই তারা উজ্জীবিত। সন্দেহ নেই, শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সমাজ-অন্বেষাই তাঁকে জোগায় নতুনতর প্রেরণা। বিশ শতকের যুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক বাস্তবতায় মার্কসবাদ মানুষকে বিকল্প সমাজ-বিনির্মাণের যে প্রতিশ্রুতি দেয়, ভারতবর্ষেও তা স্বাগত হয় বিশেষ মর্যাদায়।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা'য় সমাজতান্ত্রিক দর্শনের দুটো মাত্রা লক্ষ করা যায়। প্রথমত নতুন সমাজ-দর্শন হিসেবে মার্কসবাদকে তিনি গ্রহণ করেন এর প্রায়োগিক দিকটিসহ। তাই উপন্যাসে এসেছে রুশ বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রের পটভূমি। আবার বাংলা সাহিত্যেরই আরেক দিকপাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সমাজ-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তিনি। বস্তুত সেটাও আসে সাম্যবাদী চেতনার সাহিত্যিক রূপান্তর হিসেবে। 'কাশবনের কন্যা'য় ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিকদার চরিত্রটি যে অবস্থানে পৌছায়, তাতে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মানসস্বরূপ বিধৃত। জীবনের নিঃস্বতা শিকদারের মধ্যে জাগায় প্রবল হতাশা এবং এক পর্যায়ে তাকে তা গ্রাস করে চরমভাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে হতাশার কবল থেকে সে মুক্তি পায়। সে উজ্জীবিত হয় ভবিষ্যতের স্বপ্নে। লেখক তার এ উত্তরণটিকে প্রকাশ করেছেন নিপুণভাবে। প্রেমে ব্যর্থ শিকদার জীবনের ওপর আস্থা হারায়; জীবন তাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাতে ব্যর্থ হয়। তার প্রেমের ব্যর্থতার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য-অভাব। কিন্তু তাকে আশার প্রেরণা জোগায় জাহাজঘাটের ঘাট-মাস্টার। ঘাট-মাস্টার তাকে নতুন জীবনের গান রচনা করতে অনুপ্রেরণা জোগায়, যে-গানে থাকবে সাধারণ মানুষকে হতাশা থেকে জাগরণের ইঙ্গিত, যে-গানে মানুষ খুঁজে পাবে

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের তাৎপর্য এবং যে-গান তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবে জীবনের প্রকৃত রূপ। এভাবেই ঘাট-মাস্টারের প্রেরণায় হতাশ অবস্থা থেকে শিকদার ক্রমশ এগোতে থাকে আশাবাদের দিকে। ঔপন্যাসিক ঘাট-মাস্টার চরিত্রটিকে ব্যবহার করেছেন তার দর্শন প্রচারের বাহকরূপে। ঘাট-মাস্টার শিকদারকে যে 'নতুন গান' এবং 'নতুন জীবনের' কথা বলে তা প্রকারান্তরে লেখকের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-চেতনার প্রকাশ। হতাশ শিকদারকে প্রথমে সে স্মরণ করিয়ে দেয় সমাজের কঠিন দুর্দশার কথা। কারণ, নিঃস্ব শিকদার একা নয়, তার মত অনেকেই রয়েছে সমাজে। কেবলই ভেঙ্গে না পড়ে ওঠে দাঁড়াবার মন্ত্র শিকদার লাভ করে ঘাট-মাস্টারের কাছে :

> "আপসোস নয় কেবল, আহাজারি নয় কেবল, কেবলই ফরিয়াদ কোরো না আসমানের দিকে হাত তুলে– মনে জোর আনো, দেখো, কারা দিচ্ছে দুঃখ। তারপর লক্ষ লক্ষ দুঃখীজন মিলে যদি পারো সেই লুটের কৌশল ভেঙ্গে ফেলতে- যদি পারো সব ভণ্ডামীর শেষ করে দিতে, তাহলে আর তোমার মতো কোন মানুষ মনে মনে দুঃখ বয়ে বেড়াবে না। আত্মহত্যা করবে না ক্ষুধার জ্বালায়। তোমার ঘরের মা-বোন ঐ চালাক মানুষদের দেহের ক্ষুধা মেটাবার জন্য বলি যাবে না।"[৩৯]

শ্রেণী সচেতন সমাজ সম্পর্কে ঘাট মাস্টারের এই উক্তির মধ্য দিয়ে শ্রেণীচেতনার প্রতিফলন ও উত্তরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ধরনের প্রত্যক্ষ বক্তব্য শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসেই প্রথম দেখা যায়।

সমাজতান্ত্রিক ধারার লেখকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে হতাশাগ্রস্ততা, আত্মহত্যার উল্লেখ তেমন একটা নেই। শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসেও দেখা যায়, জীবন যার কাছে একেবারে অর্থহীন, তাকেও জোগানো হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রেরণা। 'কাশবনের কন্যা'য় স্বামীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ গৃহবধূ জোবেদা রাতের অন্ধকারে আত্মহত্যা করতে গিয়েও ফিরে আসে জীবনের প্রতি ভালবাসার টানে। প্রচলিত সমাজ, সামাজিক শোষণকে হটিয়ে নতুন সমাজ গড়ার মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসই হতাশার পরিবর্তে ঔপন্যাসিকের আশাবাদের হেতু এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই গড়ে উঠেছে তাঁর চরিত্রেরা। শিকদার যে-গানের অনুপ্রেরণা পায় ঘাট-মাস্টারের কাছে, তা-ও বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকে নির্দিষ্ট। এ-গান 'নতুন রকম গান'। তাকে এ গান গাইতে হবে 'দেশে দেশে, মাঠে মাঠে, ঘাটে ঘাটে'। এ গান 'দুঃখী মানুষদের জাগাবে– তাদের বল দেবে, ভরসা দেবে'। যে বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখক এ গানের প্রতীককে ব্যবহার করেন, তা আসলে সমাজকে আমূল বদলে দিয়ে এক নতুন পরিচয়ে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য। ঘাট-মাস্টারের মাধ্যমে লব্ধ প্রেরণার ফলে শিকদার 'এক নতুন মানুষে' রূপান্তরিত; হতাশার মধ্যেও যে 'ভগ্নপ্রাণ, বক্রমেরু' নয়। স্বভাবজাত কাব্য-প্রতিভার অধিকারী শিকদারের কণ্ঠে গান স্বাভাবিক। কিন্তু শিকদারের প্রতি ঘাট-মাস্টারের 'লক্ষ মানুষকে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা যোগাবে তোমার গান'– এ সংলাপে লেখকের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট। গানকে সরাসরি লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যেই শামসুদ্দীন আবুল কালামের সমাজদর্শনের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। আর এ লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ কারা, সেটাও পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন লেখক, ঘাট-মাস্টারের জবানিতেই :

> "যে মিথ্যা অজুহাতে জমি কাড়ে, ফসল নেয় ছিনাইয়া, ঝি-বউদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি লইয়া যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়।"[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের আলোচ্য অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসেও আমরা কৃষিজীবী মানুষদের শোষণকারী, নারী নিপীড়ক ব্যক্তিদের চিত্রায়ণ দেখতে পাই। তবে তাদের সম্পর্কে কোন উচ্চকিত বক্তব্য তাঁরা দেন না। কিন্তু একমাত্র শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসেই সমাজের সেসব অপকর্মকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে সমাজটাকে পাল্টে দেয়ার আহ্বান লক্ষণীয়। লড়াইয়ে লেখক সমাজের অধিকার-বঞ্চিত সাধারণ মানুষের পক্ষে।

লেখকের অপর উপন্যাস 'আলমনগরের উপকথা'য় সেটাই বিশদতর হয়েছে লেখকের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যের উপস্থাপনায়। বাংলাদেশের যে আর্থ-সামাজিক পটভূমিকে আশ্রয় করে 'আলমনগরের উপকথা' (১৯৫৪) উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে, তার পরিচয় নিম্নরূপ :

> "ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই মূলত বাংলাদেশে মধ্যপ্রাচ্য কিংবা অন্যান্য মুসলমান প্রধান অঞ্চল থেকে পীর-দরবেশদের আগমন ঘটে। এ দেশের প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর রূপ, সহজ-সরল মানুষ ও তাদের আতিথেয়তা, শ্রদ্ধা তাদেরকে আকর্ষণ করেছে প্রবলভাবে। তারা লাভ করেছে অতুলনীয় মাহাত্ম্য, ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি। পীরের বংশধরেরা এই ঐশ্বর্যকে মূলধন করে এ দেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছে। আধুনিক শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিঘাতে তাদের সামন্ততান্ত্রিক গৌরবে ফাটল ধরেছে। এদেশে নতুন উৎকেন্দ্রিক বিত্তবান অসাধু শিল্পপতিরা জন্ম নিয়েছে। এই দু'শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের ফলে এদেশের গণচেতনা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত গণশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে।"[৪১]

সমাজ বিবর্তনের উক্ত ঐতিহাসিক ধারার উপর ভিত্তি করে 'আলমনগরের উপকথা' উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনীর বিবরণে আমরা দেখি, মধ্য ভারতের মোগল-দরবারের পীর হযরত জামালুদ্দীন তার শিশুপুত্র ও পরিবার-পরিজন এবং বহু লোক-লস্কর ও ভৃত্যসহ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেন। সামন্তপ্রভু অরাতিদমন দেবের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জয়ী হয়ে আলমনগরে ধর্মের কল্যাণময় আদর্শের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করে পীর জামালুদ্দীন। তাঁর পুত্র আলমউদ্দীন পিতার মৃত্যুর পর আদর্শচ্যুত হয়ে শাসক-শোষকে রূপান্তরিত হয়। বিলাসে-ভোগে-অত্যাচারে নিজ জীবন ও জনজীবনকে বিপর্যয়ের চরম অবস্থায় নিক্ষেপ করে আলমউদ্দীন। একমাত্র পুত্র আলমগীরকে বিলেতে পাঠিয়ে তিনি বাঈজি ও সংগীতে আত্মমগ্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হন। সামন্ত শাসকশক্তির এই পতনোন্মুখ অবস্থায় সমাজে জন্ম নিলো মীর খাঁর মতো অসৎ শিল্পপতিরা। কৌশলে ও ষড়যন্ত্রে এই বিকাশমান শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের আভিজাত্য ও অর্থশক্তিকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হল। ইতোমধ্যে মানবতা, প্রেম ও সাম্যবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আলমগীর। ধ্বংসোন্মুখ সামন্ততন্ত্র ও উদ্ভিন্নমান শিল্পপতিশ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আলমনগরের গণজাগরণে নবাবপুত্র আলমগীর অবতীর্ণ হয় মৌল ভূমিকায়। নবাবের মৃত্যুজনিত শূন্যতার সুযোগে মীর খাঁ আলমগীরকে অধিকার করতে উৎসাহী হয় উচ্ছৃঙ্খল কন্যা শ্যালীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু প্রেম ও মনুষ্যত্বের আদর্শে আস্থাশীল আলমগীর বাঈজি কন্যা হওয়া সত্ত্বেও রোশন বাঈকে ভালবাসে। মীর খাঁর রুদ্ররোষ নিক্ষিপ্ত হয় রোশন বাঈ-এর প্রতি। তার হিংসা ও রিরংসা চরম রূপ ধারণ করলে অন্ত-রালবাসী পাগলা ময়েজের অস্ত্রাঘাতে মীর খাঁ মৃত্যুবরণ করে। হিংস্র-ক্ষিপ্ত শ্যালী নবাবপুরীতে অগ্নিসংযোগ করলে সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়।

এমনিভাবে 'আলমনগরের উপকথা' উপন্যাসের পটে সামন্তবাদী ও উঠতি বিত্তবানদের দ্বন্দ্বের ফলে এদেশের গণচেতনার জাগরণ ও গণশক্তির বিজয়ের কথা বিন্যস্ত হয়েছে। আলমনগরের সামন্ত জমিদারির

Dhaka University Institutional Repository

সমান্তরালে রয়েছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র। তারা 'পীরসাহেবের বার্ষিক ওরসের সময়' দলে দলে মাজারে ভিড় করে জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে ত্রাণলাভের আশায় :

> "সযত্ন-সঞ্চিত সম্পদ তাহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দোয়া মাঙে, আল্লার উদ্দেশ্যে কাঁদিয়া প্রাণের প্রার্থনা পৌছায়; কিন্তু দুঃখ-নিশার প্রভাত হয় না।"[৪২]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদী বিপ্লবের বার্তা এসে পৌছায় আলমনগরের গ্রামেও। উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতগামী জমিদার বংশের সন্তান আলমগীর দীক্ষা নেয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শে। বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তায় আলোড়িত তার মানস-জগৎ। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রুশ বিপ্লবের পটভূমিতে সমাজের গতি-প্রকৃতি ধরা দেয় আলমগীরের দৃষ্টিতে; তাতে রয়েছে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত :

> "সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কল বসিয়াছে, ধনতন্ত্র আজ নতুন পথে শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করিতেছে।"[৪৩]

বিশ্বে সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গনের প্রেক্ষাপটে ধনতন্ত্রের উত্থান ঘটেছিল। তেমনি ভারতবর্ষের সমাজেও চলছিল পরিবর্তনের কাল। ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় এবং ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় পুরো সমাজই যে ভূমিকেন্দ্রিকতার পথ ধরে বিকশিত হচ্ছিল, সেটি আমরা গবেষণাকর্মেরদ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি। ধনতন্ত্রের উত্থানের যুগে বৈশ্বিক বাজার-ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক সমাজেরও। ভূমির সঙ্গে যোগ সাধিত হলো পুঁজির। তখন গ্রাম-সমাজের পুরনো জমিদার শ্রেণীর স্থানে নতুন পুঁজিপতি ক্ষমতাবান শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। 'আলমনগরের উপকথা'র মীর খাঁ এমনি এক মহাজন, যার একই সঙ্গে রয়েছে ভূসম্পত্তি ও বাজার-পুঁজি। ভূমিলব্ধ অর্থ সে বিনিয়োগ করে পাটকল-ব্যবসায়; বাজারে যোগান দেয় স্থানীয় পণ্য। জমিদার-মহাজনের যৌথ নিয়ন্ত্রণে শাসিত গ্রামাঞ্চলে জমিদার-পুত্র আলমগীর যাদের শ্রীহীন জীবনের দুর্গতি-মোচন কামনা করে, 'তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জোঁকের কামড় খেয়ে, রোদে-বৃষ্টিতে পুড়ে... বন্যার সাথে লড়াই করে, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে ভুগে' ফসল ফলায় এবং সেই ফসল 'নিজেরা উপবাসী থেকে' তুলে দেয় জমিদার-মহাজনের ঘরে। সমাজ-ব্যবস্থার জাজ্বল্যমান বৈষম্য আলমগীরের চোখে স্পষ্ট :

> "উৎপাদন ও বন্টনের অসম-ব্যবস্থা সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষের দুঃখ মোচনের পথে প্রধান অন্তরায়। আলমনগরে তাহারই পুনরাবৃত্তি।"[৪৪]

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র রূপায়িত হয়েছে আলমনগরের প্রতীকী উপস্থাপনায়।

আসলে বিলাত থেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আসা উপন্যাসের নায়ক নবাবপুত্র আলমগীর ছিল গণমানুষের মর্যাদা ও প্রেমের মর্যাদায় বিশ্বাসী। সে গণমানুষকে শোষণহীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিল। তাই পারিবারিক ও শ্রেণীগত স্বার্থ-চেতনার বাইরে এসে শোষণমুক্ত জীবন গড়ার প্রত্যয়ে নবজীবন চেতনার প্রতীক নায়ক আলমগীর আপন অনুভব ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছে:

> "সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কল বসিয়াছে, ধনতন্ত্র নতুন পথে শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করিতেছে। নিজস্ব জীবনযাত্রা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, যে দারিদ্র্য ও

Dhaka University Institutional Repository

> দুর্দশা এ দেশবাসীকে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি নাই।... এই দেশের লোক প্রধানত কৃষিজীবী। কৃষক জীবনের সহিত ধর্মের স্বাভাবিক যোগকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না।... এই আস্থা জীবনানুগ। ধর্ম সেই আস্থারই প্রমাণস্বরূপ। ইহাকে ব্যাহত না করিয়াই জমির বিলি-বন্টন ও উৎপাদনকে সমতার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিতে বাঁধা কোথায়?... আলমগীরের মনে হইতে লাগিল, এই দেশে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া আদর্শ স্থাপন করা যায়।"[৪৫]

অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ধর্মের শ্রেয়োবোধের সমন্বয়ে এক অলীক স্বর্গরাজ্য গড়ার স্বপ্ন– এ অনুভবের মূলে আমরা সক্রিয় দেখতে পাই। '৪৭-এর অব্যবহিত পরবর্তী সমাজমানস বিচারে ঔপন্যাসিকের এ জাতীয় উপলব্ধি অস্বাভাবিক নয়। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে উপন্যাসের নায়ক আলমগীরের উক্ত অনুভব ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আসলে ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের মূল বক্তব্যকেই উপস্থাপন করেছেন। কারণ উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কৃষক তোফেল, রতন কিংবা মফেজের মধ্যে বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত মানুষের দুঃখক্লিষ্টতার যে চিত্র ধরা পড়েছে, তার বিচারে ঔপন্যাসিকের সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত বক্তব্যকে সহানুভূতিপূর্ণ বলে মনে হয়। অর্থাৎ এসব বৈষম্য-অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঔপন্যাসিক একটি কল্যাণকর বিকল্পের সন্ধান করেছেন, যার বদৌলতে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন হবে শোষণমুক্ত এবং দুঃখ-যন্ত্রণাশূন্য। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে আলমনগর বা ক্ষীরসায়র সম্পর্কে প্রদত্ত শামসুদ্দীন আবুল কালামের বক্তব্যে উক্ত তাৎপর্যের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাই :

> "অতঃপর ক্ষীরসায়রে নতুন জীবনান্দোলন দানা বাঁধিয়াছে...। অবশ্য মানুষ কেবল খুঁজিতেছে মুক্তি, তাহার জীবন বিকাশের অধিকার। সেই সন্ধান অতি তীব্র, অতি কঠোর তার পথক্রমণ।"[৪৬]

এভাবেই ঔপন্যাসিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম আলোচ্য উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার প্রত্যয়কে সামনে রেখে নতুন সমাজ নির্মাণের ইঙ্গিতকে উপস্থাপন করেছেন।

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

আবু ইসহাক রচিত *'সূর্য দীঘল বাড়ি' (১৯৫৫) নামক একটি মাত্র উপন্যাস আলোচ্য কালপর্বের* প্রতিনিধিত্ব করে। উপন্যাসটিতে লেখকের বস্তুবাদী দৃষ্টির পরিচয় মেলে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ব্যক্তির শ্রেণী অস্তিত্ব ও সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি অংকিত হয়েছে এ উপন্যাসে। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০/১৯৪৩) থেকে দেশ বিভাগ (১৯৪৭) এই পাঁচ বছরের সময় পরিসরে এ উপন্যাসের ঘটনাংশ বিস্তৃত। বহমান সময়ের পটপরিসরে বাংলাদেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জীবন ও সেই সর্বগ্রাসী পরিচয় এতে বিধৃত হয়েছে। উপন্যাসে চিত্রিত নির্দিষ্ট সময়ের বৃত্তেই ঔপন্যাসিক পূর্ববঙ্গের গ্রামে আবহমানকাল ধরে গড়ে ওঠা সংস্কার, বৈষম্য, শোষণের বাস্তবতাকে উপস্থিত করেন। দেশ বিভাগের সমকালীন বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে এ উপন্যাসে আমরা পাই সময়াতীত পূর্ববঙ্গের গ্রামকে।

উপন্যাসটিতে গ্রামীণ সমাজের তিনটি শ্রেণীর বিশদ চিত্র পাওয়া যায়। প্রথমতঃ গদু প্রধান, খুরশীদ মোল্লা, কাজী খলিল বক্‌শ প্রভৃতি জমিদার-মহাজন-কালোবাজারি, যারা গ্রামে গণ্যমান্য বলে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ জয়গুন, শফীর মা, জোবেদালী ফকির প্রভৃতি নিম্নবিত্ত মানুষ– এরা প্রত্যেকেই ভূমিহীন। এদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে শফীর মা ভিক্ষুক, জয়গুন গ্রাম থেকে চাল নিয়ে বিক্রি করে নিকটস্থ মফস্বল শহরে এবং জোবেদালী ভণ্ড ফকির। এদের মাঝামাঝি করিম বক্শ– স্বল্প জমির মালিক। জমির আয়ে সংসার চলে না বলে অন্যের জমিতে শ্রম খাটায়। উপন্যাসে কৃষিভিত্তিক বাংলার গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের বিশদ চিত্র আছে। তবে সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যে নিম্নবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামই এতে প্রধান। সামাজিক সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েও মূলতঃ নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাহিনীই মুখ্য হয়ে উঠেছে। জয়গুনের জীবনের প্রতিকূলতার সিংহভাগ সমাজ-সৃষ্ট। মন্বন্তরের সময় দুর্ভিক্ষের জ্বালা থেকে বাঁচতে প্রথমে তালাকপ্রাপ্তা এবং পরে বিধবা জয়গুন শহরে যায়, কিন্তু জীবিকান্বেষণের ব্যর্থতা নিয়ে সে গ্রামে ফেরে।

'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে এই মন্বন্তরের (১৯৪৩) বিবরণকে ঘিরে। অস্তিত্বের মৌল দাবি মেটাতে মন্বন্তরের সময় যে জনস্রোত চিরপরিচিত গ্রামকে পেছনে ফেলে শহরমুখী হয়েছিল, নগরজীবনের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতায় রক্তাক্ত, বিপন্ন, নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে তাদের পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পটভূমিকায় 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের কাহিনীতে উদ্বাস্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের শোষণ বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি অংকিত হয়েছে।-

> "আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই-বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।
>
> অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। সেখানে মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য, হোটেলে খাবারের সমারোহ দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। ভিরমি খেয়ে গড়াগড়ি দেয় নর্দমায়। এক মুঠো ভাতের জন্য বড়লোকের বন্ধ দরজায় ওরা মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়।...
>
> যারা ফিরে আসে তারা বুকভরা আশা নিয়ে আসে বাঁচবার। অতীতের কান্না চেপে, চোখের জল মুছে তারা আসে। কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে নয়। তাদের শির-দাড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ শুষ্ক ও বিবর্ণ।"[৪৭]

এই উন্মুলিত জনস্রোতেরই অংশ জয়গুন ও তার দুই সন্তান। বাইরের ছন্নছাড়া অসহ্য জীবন থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে জয়গুন গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু 'দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে' সব সম্বল তার নিঃশেষিত হয়েছিল উদরের প্রয়োজনে। একমাত্র অবলম্বন জঙ্গলাকীর্ণ ভিটে পরিষ্কার করে সেখানেই নতুন করে আবাস গড়তে চায় জয়গুন। কিন্তু গ্রাম্য বিশ্বাস ও সংস্কারে পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী সূর্য দীঘল বাড়িটি ছিল মানব-বসতি স্থাপনের অযোগ্য। তবুও গ্রামের অন্যান্য বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন এই ভৌতিক পরিবেশেই জয়গুন ও শফীর মাকে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, গ্রাম্য চক্রান্ত, রিরংসা, লোভ এবং নেপথ্যচারী মানবীয় সক্রিয়তাই 'সূর্য দীঘল বাড়ি'কে করে তুলেছে ভীতিকর ও বাস-অযোগ্য। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা জয়গুন ছেলে হাসু ও মেয়ে মায়মুনকে নিয়ে এই সূর্য দীঘল বাড়িতে নতুন করে শুরু করে তার জীবন সংগ্রাম। পুত্র হাসুকে সঙ্গে নিয়ে তার অস্তিত্বের এই নবযাত্রা বিচিত্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। জয়গুন ট্রেনে করে চাল এনে বিক্রি করে আর হাসু স্টেশনে মোট বেয়ে সামান্য আয়ে জীবন নির্বাহে উদ্যোগী হয়। জয়গুনের দ্বিতীয় স্বামী করিম বক্শ জীবিত, 'দুর্ভিক্ষের বছর

বিনা দোষে' সে জয়গুনকে তালাক দিয়েছিল। তার গর্ভজাত সন্তান কাসুকেও নির্মমভাবে নিজের কাছে নিয়ে যায় করিম বক্শ

> "হাসু ও মায়মুনকে নিয়ে ভেসেই চলছিল জয়গুন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় অকূল পাথারে কূল সে পায়। লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। তাঁকে বাঁচতে হবে, ছেলে-মেয়েদের বাঁচাতে হবে– এই সংকল্প নিয়ে আকালের সাথে পাঁচ বছর সে লড়াই করে আসছে।"[৪৮]

ধর্মশাসিত সমাজে মেয়ে মানুষের পক্ষে কাজ করে অর্থ আয় করা অপরাধ। কিন্তু ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ধর্মের অনুশাসন জয়গুন ভুলে যায় এক মুহূর্তে। জীবনধারণের কাছে ধর্মের বারণ তুচ্ছ হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায়।

অমানবিক সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে জয়গুনের ভাবনা তাই দ্বিধাহীন।-

> "খাইট্যা খাইমু। কেউরডা চুরি কইরাও খাই না, খয়রাত নিইয়াও খাই না।"[৪৯]

জয়গুনের এমনি নির্দ্বন্দ্ব ভাবনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার জীবন সংগ্রাম, শ্রেণীগত জীবনসত্য তথা বেঁচে থাকার অর্থ। কেবল নিজের জন্য নয়, সংসারের আরো মানুষের অন্ন যোগাড় হয় তার শ্রমে। ধর্মের দোহাই দিয়ে রক্ষণশীল সমাজ তাকে ঘরে আবদ্ধ করতে চাইলেও জয়গুন সেই নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ করে তীব্র ক্ষোভ– "তোবা আমি করতাম না। আমি কোন গোনা করি নাই।" [৫০]

জয়গুন ছাড়াও 'সূর্য দীঘল বাড়ি'র কৃষিজীবীরা অহোরাত্র কেবল বেঁচে থাকার চিন্তায় মগ্ন। দিনমজুর লেদুর সংলাপে আবু ইসহাক চিত্রিত গ্রাম সমাজের সেই অমানবিক চরিত্র পরিস্ফুট, যেখানে জমিদার মহাজন ও সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে যোজন-যোজন ফারাক চিহ্নিত হয়ে উঠে:

> "তোমার গোলাভরা ধান আছে। তুমি এক সেরের বদলে দুই সের খাইলে তোমার গোলা ঠিক থাকব। কিন্তু সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া রোজি করি পাঁচসিকা। এই ট্যাকা পেডে দিমু, কাপড় পিন্দুম, না এর তন রাজার খাজনা দিমু? ঘরে পরিবার আছে।... সারাদিন খাইট্যা সোয়াসের চাউল গামছায় বাইন্দ্যা ঘরে ফিরি।"[৫১]

এই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি যারা 'এক বাটি ফেনের জন্য', 'এক বাটি খিচুরীর জন্য' মন্বন্তরের সময় দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিল, তাদের অনেক আশা ছিল স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু দেশ বিভাগকালীন স্বাধীনতা অর্জিত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন জনজীবনে কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। নতুন রাষ্ট্রে নিম্নবিত্ত মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই আশাভঙ্গের বেদনা–

> "কত আশা ভসসা আছিল। স্বাধীন অইলে ভাত-কাপড় সায্য অইব। খাজনা মকুব অইব। কিন্তু কই বেবাক ফাটকি।"[৫২]

নিম্নবিত্ত মানুষের শ্রেণীসচেতনতা এভাবে সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীতে লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের শেষাংশে আমরা দেখি, সংগ্রামরত প্রতিবাদী জয়গুনের বালিকা কন্যা মায়মুনের বিবাহের কারণে ধর্মশাসিত সমাজের চাপে বাইরের কর্মক্ষেত্র থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় স্বামীগৃহ থেকে চিরদিনের জন্য মায়মুনের প্রত্যাবর্তন, গদু প্রধানের রিরংসা, আক্রোশ, জয়গুনের জীবনমূলকে বিশুদ্ধ করে তোলে। ফলে সে ধর্মের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে অস্তিত্বকেই পরম বলে গ্রহণ করে :

Dhaka University Institutional Repository

> "ক্ষুধার অন্ন যার নেই, তার আবার কিসের পর্দা, কিসের কি? সে বুঝেছে জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূলমন্ত্র। জীবনরক্ষা করতে ধর্মের যে কোন অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নাই।"[৫৩]

এ কারণে ধর্মের শৃঙ্খল ছিন্ন করে জয়গুন পুনরায় বেরিয়ে পড়ে অস্তিত্ব রক্ষার অন্বেষণে। ফলে জয়গুনের গ্রামে বসবাস ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরোয়া না করে নিজের স্বাধীন ইচ্ছেমত চলার খেসারত তাকে দিতে হয় শেষ পর্যন্ত। রাতের অন্ধকারে গদু প্রধান তার অনুচরদের নিয়ে হত্যা করে জয়গুনের দ্বিতীয় স্বামী করিম বক্শকে এবং রটিয়ে দেয় যে, করিম বক্শ মারা পড়েছে সূর্য দীঘল বাড়ির 'ভূতের' আক্রমণে। ফলে 'সূর্য দীঘল বাড়ি'র অপর বাসিন্দা শফির মা-সহ জয়গুন তাদের সন্তানদের নিয়ে পুনরায় গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। বাঁচার আশা নিয়ে জয়গুন শহর থেকে ফিরে এসেছিল যে গ্রাম সমাজে, তা আসলে মানুষের বাঁচার সম্ভাবনাকে সংকুচিত করে দেয়। এটিই সত্য যে, অসুস্থ-ক্লিষ্ট সমাজে জয়গুনের সুস্থ বসবাস সম্ভব নয়।

ভূ-সম্পত্তিধারী মহাজন কালোবাজারি নিয়ন্ত্রিত বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের গ্রাম নিম্নজীবী মানুষের কাছে প্রসন্ন আশ্রয়ের পরিবর্তে বৈরী ভূখণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। পরিসমাপ্তিতে জয়গুনের গন্তব্য আর ঔপন্যাসিক দেখান নি। জয়গুনের অনিকেত যাত্রার বিবরণ নিম্নরূপ :

> "ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে জয়গুন ও শফীর মা বেরিয়ে পড়ে। মনে তাদের ভরসা খোদার বিশাল দুনিয়ায় মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই তারা পাবেই।"[৫৪]

নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের মানুষ এভাবে পুনরায় ছিন্নমূল হয়ে যায়। এই নবযাত্রার সম্মুখ ভূমিতে মীমাংসাহীন অন্ধকার ও শূন্যতাই যেন একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণে আমরা দেখি উক্ত নির্বিত্ত ও অসহায় ক্ষুদে দলটি শুধু নির্যাতিত ও বঞ্চিতই হয়েছে। নিপীড়ন ও অত্যাচার সম্পর্কে জয়গুন পরিবারের সচেতনতা ও গ্রামত্যাগ সব গ্রামবাসীর মধ্যে শ্রেণীচেতনা সঞ্চারিত করতে পারেনি। এ কারণে সংগঠিত শ্রেণীসংগ্রামের ইঙ্গিত বা পরিচয় উপন্যাসটিতে নেই, তবে শোষিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর প্রতি সহমর্মিতা এবং অত্যাচারী শোষকদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সঞ্চারে লেখক উপন্যাসেটিতে যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়েছেন। এভাবেই 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনসত্য রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসের শেষোক্ত চলমানতার ফ্রেমে এক নতুন শ্রেণী অস্তিত্বের অগ্রযাত্রার সম্ভাব্য ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কিন্তু জয়গুন পরিবারের সংগ্রাম সমষ্টিচেতনায় জাগ্রত নয় বলেই উপন্যাসের শেষোক্ত চলমানতার ফ্রেমে নতুন শ্রেণী অস্তিত্বের অগ্রযাত্রা নির্মাণে লেখক তেমন সফল হতে পারেননি। ঔপন্যাসিক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে একে সফল রূপ দিতে পারতেন বলা যায়।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১)

আলোচ্য কালপর্বে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করে আহমদ ছফা'র একটি মাত্র উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী' (১৯৬৭)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ জীবনধারা ও সামাজিকতা, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ও সংস্কারাচ্ছন্নতা, নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চতর শ্রেণীর ঘৃণা ও নির্যাতন, মাতব্বরের স্বার্থপরতা ও নিপীড়ন এবং কৃষক-কর্মীদের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকে সংগঠিত ও শ্রেণীসচেতন করার উদ্যোগ এ সবকিছুই একটা সামগ্রিক চেতনার আলোকে 'সূর্য তুমি সাথী' (১৯৬৭) উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক পর্যায়ে গ্রামীণ সমাজকাঠামোতেও শ্রেণীসচেতন রাজনৈতিক ধারার সূত্রপাত হয়। মানুষকে হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসেবে নয়, শোষক ও শোষিত শ্রেণীভুক্ত করে সমাজসত্যের তাৎপর্যময় রূপ উন্মোচন করেছেন আহমদ ছফা তাঁর 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসে।

রাষ্ট্র শোষণ, জাতি শোষণ ও শ্রেণী শোষণের ত্রিবিধ চাপে ছিন্নমূল অস্তিত্ব 'হাসিম' ও সমষ্টির সমগ্র রূপ অংকন করেছেন ঔপন্যাসিক। গ্রন্থের নায়ক হাসিম ধর্মান্তরিত হরিমোহনের (পরিবর্তিত নাম মুহাম্মদ ইসমাইল খান) পুত্র হাসিমের জীবনের ইতিবৃত্ত উন্মোচন সূত্রে ঔপন্যাসিক সমাজসত্যের গভীরতল স্পর্শ করেন। হাসিম সম্ভ্রান্ত কাজী বাড়ির বাঁদী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। মর্যাদাহীন নিম্নবিত্ত হাসিম সামাজিক নির্যাতনের সার্বক্ষণিক শিকার। হাসিম কবিয়াল বা বয়াতি, সারিন্দা বাজিয়ে গান করে। ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক চেতনার উর্ধ্বে তার অবস্থান। ধর্মান্তরের ফলে সম্পদবঞ্চিত হরিমোহনের পুত্র হাসিম সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। শ্রেণী অবস্থান হাসিমের জীবনধারাকে গ্রামের অন্যান্য মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। ধর্ম বিচ্ছিন্ন, উত্তরাধিকার বিচ্ছিন্ন হাসিম নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিলেও ধর্মান্ধ মুসলমানরা তাকে 'বানিয়ার পুত' বলে গালি দেয়। সবদিক থেকে নিরাশ্রয় হাসিমের জীবনবৃত্ত উপস্থাপন সূত্রে ঔপন্যাসিক শ্রেণীগত জীবন সত্যের অনালোকিত রূপকেই উন্মোচন করেছেন।

লোকবিশ্বাস, সংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, গ্রামীণ দলাদলি, ঈর্ষা-দ্বেষ–স্থৌল্য প্রভৃতির মধ্যেও মানুষের অস্তিত্ব সম্মুখেই ধাবিত হয়। এই ধাবমান অস্তিত্বের আলোকবর্তিকা হিসেবে হাসিমের ক্রিয়াশীলতার ভূমিকাই মুখ্য। কৃষক সমিতির আদর্শবাদী চরিত্র, মনির আহমদ, হিমাংশু ধর ও কেরামত ভাই-এর সাহচর্য ও আদর্শবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে হাসিম কৃষক সমিতির (প্রগতিশীল কৃষক সংগঠন) কর্মী হয়ে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং শ্রেণীসচেতন হয়ে ওঠে। গ্রামের নির্বিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর পক্ষাবলম্বী কৃষককর্মী হাসিম স্থানীয় সমাজপতিদের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে। অপরাপর চরিত্রের মধ্যে মাতবর খলু, অধর-ধর, কানা আফজল, জাহেদ বকসু– সবাই বাস্তবধর্মী শোষক শ্রেণীভুক্ত চরিত্র।

সমাজপরিত্যক্ত উন্মূলিত হাসিম কৃষক সমিতির কর্মী হবার পর সংঘশক্তির অংশ হিসেবে আবিষ্কার করে নিজেকে। মানুষ হিসেবে নিজ অস্তিত্বগত অবস্থানকে সনাক্ত করতে শেখে সে। হাসিমের আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্ব-অভীপ্সার স্বরূপ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কারা যায় :

> "সভার নেতারা বক্তৃতা করলেন। মনে হলো না যে, তারা দূরের মানুষ। যেন তাদেরই একান্ত আপনজন– কাছের মানুষ। দুঃখ-দুর্দশাকে সোজা ভাষায় সহজভাবে চোখের সামনে তুলে ধরলো না শুধু, কারণগুলোও বর্ণনা করলো। শ্যামল চেকন তলোয়ারের ফলার মতো আন্দোলিত শরীরের মানুষটার কথাগুলো তার চেতনায় সংগীতের মতো বাজতে থাকলো।
>
> এক সময় নাকি সমাজের সকলে সমান ছিলো, সকলে সমানভাবে স্বাধীন ছিলো। দাস ছিলো না কেউ কারো। সকলে সমানভাবে পরিশ্রম করতো, সমানভাবে ফলভোগ করতো। কেউ বড় কেউ

Dhaka University Institutional Repository

> ছোট ছিল না। মানুষ মানুষের মেহনত চুরি করে মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছে। কৃষক-শ্রমিকের বুকের খুন-ঝরা মেহনত চুরি করে ধনী হয়েছে মানুষ। মেহনতি মানুষের বুকের তাজা রক্ত তাদের বাগানে লাল লাল গোলাপ হয়ে ফোটে। সহস্র রকম পদ্ধতিতে তারা কৃষকের রক্ত শুষে নিয়েছে। হাসিম যেন চোখের সামনে শোষণের নলগুলো দেখতে পেল। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এ শোষণের পথ বন্ধ করতে হবে। সে জন্য দরকার সমিতি। ঘরে ফেরার সময় বক্তৃতার কথাগুলো হাসিমের চেতনায় বারংবার আবর্তিত হয়ে ঘোরে। পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকের শ্রম চুরি করে ধনীরা বালাখানা গড়েছে। হাসিম তো শ্রমিক, তারও শ্রম চুরি করেছে। এতোক্ষণে ধরতে পেরেছে অধরবাবু, কানা আফজল আর খলুদের সঙ্গে তার মতো মানুষদের তফাৎটা কোথায়। বক্তৃতার আলোকে চেনা মানুষদের নতুন করে খুঁটিয়ে দেখে সে। তাদের শরীর থেকে যেন লাল লাল তাজা রক্ত ঝরছে। আর অধরবাবুদের মুখে রক্তের লাল ছোপ। প্রবল উত্তেজনায় দু'হাত মুঠিবদ্ধ হয়ে এলো।"[৫৫]

এমনিভাবে শ্রেণীসচেতন হাসিমের চেতনার সুপ্ত অবরুদ্ধ কলিগুলো দল মেলতে শুরু করে। হাসিমের চেতনা উত্থিত ভাবনা সূত্রে ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা মানুষকে হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসেবে নয়– শোষক ও শোষিত শ্রেণীভুক্ত করে সমাজসত্যের তাৎপর্যময় রূপ উন্মোচন করে দেখান। যেমন নিচের এই অংশটুকু:

> "ভয় শুধু হিন্দুকে? হিন্দুরা কি মরণের চাইতেও ভয়ংকর? হিন্দুদের মধ্যে কি ভাল মানুষ নেই? মুসলমানদের মধ্যে কি খারাপ মানুষ নেই? জাহেদ বকসু, খলু মাতব্বর, কানা আফজল– এরা কি ভাল মানুষ? হেডমাস্টার গিরিজাশংকর বাবু যিনি মুসলমানের ছেলের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন, তিনি কি খারাপ মানুষ? হাসিমের ধারণা, কানা আফজল আর অধরবাবুরা একযোগেই তো মৃত্যুর ব্যাপার করে। ওরা হিন্দু নয়, ওরা মুসলমান নয়, ওরা একজাত– অত্যাচারী। এ সত্যটা মানুষ বোঝে না কেন? কেন বোঝে না? ভয়ানক দুঃখ হয়, যে দুঃখের কোন রূপ নেই।"[৫৬]

উপন্যাসের কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কৃষিভিত্তিক সমাজে শক্তিদ্বন্দ্বের প্রধান উৎস জমি। জমি সংক্রান্ত দাঙ্গায় বরগুইনীর পাড়ের পাশাপাশি দুটো গ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কৃষক সমিতি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও গাছবাড়িয়ার খলু মাতব্বর শক্তিদম্ভে সমিতির সদস্যদের তাড়িয়ে দেয়। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। সাতবাড়িয়ার কাদের মিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে খলু মাতব্বর পরাস্ত হয়। তার পক্ষেও লাঠিয়ালরাই বেশি জখম হয়। এমনিভাবে গ্রামের বিধবা মায়ের সন্তান যুবক লাঠিয়াল 'ছদু' জখম হয়ে প্রাণ হারায়। তখন শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ কানা আফজল ও জাহেদ বকসুর মধ্যস্থতায় ছদুর পরিবারের সাথে মুখে মুখে দু'কানি জমি দানের রফায় সব ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। খলু মাতবরের উদ্দেশে পড়শি চাচা চন্দ্রকান্ত ও হাসিমের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শ্রেণীশোষণের সেই নিষ্পেষিত ভয়াবহতারই চিত্র পাওয়া যায় :

> "কেন ভাইপুত, তোরে আগে কি কইলাম। বুঝিলি ছদুর জানের দাম মোডে দুই কানি জমিন না? আজিয়া দিব কালিয়া কাড়ি লৈব। বদমাইশ পোয়ারে আগে এত চেষ্টা গরিও বিয়া গড়াইত না পারে। অহন এউগ্‌গা তৈয়ারি বউ পাই গেল। কেন ভাইপুত রাধামাধবের লীলা 'তেল্যা মাথায় তেল, আতেলা মাথা শুকাই গেল'। আল্লাহ তো খল্যা আর কানা আফজল্যার, কি কস?...হ্যাঁ, আল্লাহ খলু আর কানা আফজলের।" হাসিম কথা কয় না। মনে মনে আল্লাহর কেমন বিচার

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। আল্লাহ তাদের না হলে অন্যের সর্বনাশ করেও কেমন করে তারা লাভবান হয়! আজ দু'কানি জমি মুখে মুখে দিলো, কাল কেড়ে নিয়ে যাবে। আনুর সঙ্গে খাদিম আলীর মেয়ের বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল দু'বছর আগে। অনেক ভেট-বেগার বয়েও কোন ফল হয়নি। ভেট-বেগারে খাদিম আলীর মন ওঠেনি। সরল মানুষ খাদিম আলী। শত অনুরোধে খলু মাতব্বরের মতো পেঁচী মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে রাজি হয়নি। খাই-খাসলত ভাল দেখে ছদুকেই মেয়ে বিয়ে দিয়েছিল। ছদু গেছে, বউটা অল্প বয়সে রাঁড়ি হয়েছে। এখন খলু মাতব্বরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হতে খাদিম আলীর তরফ থেকে কোন আপত্তি ওঠার কথা নয়। কেমন জটিল আর ঘোরালো আল্লাহর কল। সে কলে গরিবেরাই বা কেন পিষে যায়! চন্দ্রকান্ত শুধু নয়, গ্রামের সকলের মনে একথা লেগেছে। কিন্তু মুখ দিয়ে বের করার সাহস নেই কারো। বুকের কথা মুখে বলতে পারে না কেন মানুষ? কেন মানুষ মুখ ফুটে অত্যাচারকে বলতে পারে না অত্যাচার? এ সকল মৌলিক প্রশ্ন হাসিমকে ভয়ানকভাবে খোঁচায়।"[৫৭]

এভাবেই অশিক্ষিত ছিন্নমূল হাসিম সংঘ জীবনাবেগে প্রাণিত হয়ে পরিণত হয় সাহসী কর্মীপুরুষে। এক সময়ে দেখা যায়, অন্ধ ধর্মশক্তি, সমাজশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি কৃষক সমিতির কার্যক্রমে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সিগারেট কোম্পানির জমি দখলের প্রতিবাদে গ্রামের কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনে কৃষক সমিতির সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। কৃষক সমিতির অন্যতম সংগঠক মনির আহমদের বক্তৃতায় সেই পরিচয় প্রকাশিত :

"সিগারেট কোম্পানি ফ্যাক্টরি বানাতে চায় বানাক। পাহাড়ের দিকে বিস্তর জমি খালি পড়ে আছে। কোম্পানির টাকা আছে ট্রাক্টর আনুক। পাহাড় ভেঙ্গে ময়দান করে একটা কেন, একশোটা ফ্যাক্টরি করা যায়। আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এ বিলের জমি না হলে আমাদের চলবে না। বাঁচবো না আমরা। আট হাজার টাকাতেও এ জমি ছাড়বেন না। কেননা, এ জমি ছাড়া আমাদের অন্য কোন নির্ভর নেই। কারো ব্যবসা নেই, চাকরি নেই, অন্য কোথাও বাড়তি জমি নেই। যাদের এ বিলে কোন স্বত্ব নেই, তাদের অনেকের এ বিলের জমি ভাগে চাষ করে, মজুর খাটে। চাকরি নওকরির টানে তারা কখনো বিদেশে যায়নি। বরগুইনির উর্বরা পলিতে কোম্পানির নজর পড়েছে। সুতরাং গ্রামের মানুষ কি নির্বিবাদে সে জমি ছেড়ে দেবে? না, না। কিছুতেই তা হতে পারে না।

"না, না" কখ্খনো না। এটা অত্যাচার। গরিবের ওপর অত্যাচার। এ অত্যাচারে কোম্পানির সঙ্গে ইউনিয়নের মেম্বার-চেয়ারম্যান যোগ দিয়েছে। খলু মাতব্বর, জাহেদ বকসু, অধরবাবু, চেয়ারম্যান আফজল মিয়ার মতো মানুষ, যারা আপনাদের বারবার কেনাবেচা করেছে, তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেন কি? এবারও তারা আপনাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। কোম্পানি তাদের টাকা দেবে। অনেক বেশি টাকা। অতো টাকা জীবনে আপনারা কোনদিন দেখেননি। তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবির ওপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবেন কি? আপনাদের একতার বল যদি অটুট থাকে কেউ জমিতে হাত বাড়াতে পারবে না। পারবেন কি আপনারা?'

'আঁরা এক থাইক্কম। ক্যারে জমিনত দাগ লাগাইতম দিতাম নয়।' (আমরা এক থাকব, কাউকে জমিতে দাগ লাগাতে দেব না)। এক সঙ্গে সমবেত জনতা সায় দিলো।"[৫৮]

এভাবেই কৃষক আন্দোলনের নেতা মনির আহমদ গ্রামের সবার মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগিয়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

তার ফলস্বরূপ দেখা যায়, সিগারেট কোম্পানির জমি দখলের প্রতিবাদে গ্রামের কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়ে মনির আহমদ সহ সমিতির অপরাপর সদস্য হিমাংশু বাবু, মান্নানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শ্রেণীসচেতন হাসিমের উক্তিতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে দেখি :

> "কেরামত ভাই আর কিছু ন গরিবা?" (কেরামত ভাই, আর কিছু করবে না?)।
>
> "না ভাই, আর কিছু করার নেই বর্তমানে।" জবাব দিলো কেরামত।
>
> "এই যে পঁচিশ জন ভালা মাইনষেরে জেয়লত লৈ গেল, তার পতিকার কি?" (এই যে পঁচিশ জন ভাল মানুষকে জেলে নিয়ে গেল, তার প্রতিকার কি?)।
>
> "হাসিম ভাই, প্রতিকার এতো সহজ নয়। এই তো অত্যাচারের সবেমাত্র শুরু। জালিমেরা বনের বাঘের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠবে, আর মজলুমেরা সকলে একজোট হয়ে যতদিন না রুখে দাঁড়াচ্ছে কোন প্রতিকার নেই। মনির আহমদ কিংবা হিমাংশুবাবু তো নয় শুধু, এমনি হাজার মানুষ বিনা অপরাধে জেল খাটছে।"[৫৯]

–কৃষক কর্মী কেরামতের উক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে শ্রেণীচেতনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে।

এভাবেই 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসে সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের সম্ভাবনা, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি সচেতনতার ইঙ্গিত এবং গ্রামীণ সমাজে শিল্প-কারখানার শ্রমিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসের পরিশেষে হাসিম ও জহুরার গ্রাম ছেড়ে কারখানায় কাজ করতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত হয়। বলা যায়, একটা হ্যাঁ অর্থক ও আশাবাদী জীবনচেতনার বিন্যাসে 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আহমদ ছফা শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের সম্ভাবনাকে সার্থকতার সঙ্গেই রূপায়িত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ও সূত্রনির্দেশ

[১] রফিকউল্লাহ খান, শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, পৃ: ৫৬।
[২] পদচিহ্ন, আশ্বিন ১৩৭৫, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ: ৫৩।
[৩] পদচিহ্ন, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৬-৫৭।
[৪] পূর্বোক্ত, পৃ:২৩৬-২৩৭।
৫ পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৯।
[৬] রফিকউল্লাহ খান, সত্যেন সেনের উপন্যাস- বিষয় স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প চেতনা, পৃ: ৫৫।
[৭] সত্যেন সেন, উত্তরণ, স্টুডেন্ট ওয়েজে, বাংলাবাজার, ১৯৭০, পৃ: ৫৩।
[৮] উত্তরণ, পূর্বোক্ত, পৃ: ১১৭
[৯] পূর্বোক্ত, পৃ: ২১০।
[১০] পূর্বোক্ত, পৃ: ২১১।
[১১] পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৬০-৬১।
[১২] সত্যেন সেন, সেয়ানা, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৩১০।
[১৩] সত্যেন সেন, মা, পরিচ্ছেদ: ১০, পৃ: ৮০ ।
[১৪] শওকত ওসমান, জননী, ঢাকা বুকস, ঢাকা, ১৯৬১,পৃ:১৪৫।
[১৫] শওকত ওসমান, বনি আদম, শওকত ওসমান উপন্যাস সমগ্র, ১ম খণ্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, ২০০১, পৃ: ১১২।
[১৬] পূর্বোক্ত, পৃ:২০।
[১৭] শওকত ওসমান, পূর্বোক্ত, পৃ:১১৫।
[১৮] শওকত ওসমান, রাজা উপাখ্যান, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ: ১২৩।
[১৯] শওকত ওসমান, ক্রীতদাসের হাসি, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৩, ঢাকা, পৃ:২০।
[২০] পূর্বোক্ত, পৃ:১২১।
[২১] সরদার জয়েন উদ্‌দীন, আদিগন্ত, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরি,ঢাকা, ১৩৬৩, পৃ: ২০১
[২২] পূর্বোক্ত, পৃ:১১১।
[২৩] পূর্বোক্ত, পৃ:১৯৯।
[২৪] পূর্বোক্ত, পৃ:১৫৪।
[২৫] পূর্বোক্ত, পৃ:১৯৮।
[২৬] পূর্বোক্ত, পৃ:১৫৪।
[২৭] পূর্বোক্ত, পৃ:১০২।
[২৮] পূর্বোক্ত, পৃ:১৫২।
[২৯] আহমদ কবির, সরদার জয়েনউদ্‌দীন (জীবনী গ্রন্থমালা) ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ: ৩৯।
[৩০] সরদার জয়েন উদ্‌দীন, অনেক সূর্যের আশা, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৪, চট্টগ্রাম, বইঘর, 'ভূমিকা'।
[৩১]. সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৮৬, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ:২৫।
[৩২]. সরদার জয়েন উদ্‌দীন,অনেক সূর্যের আশা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪,নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ: ৩২৩।
[৩৩]. রণেশ দাশ গুপ্ত, উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৩, ঢাকা, পৃ: ২১০।
[৩৪] শহীদুল্লা কায়সার, সংশপ্তক, পূর্ববাণী, ঢাকা, ১৯৩২, পৃ:১৫১।
[৩৫]. পুর্বোক্ত,পৃ: ৫৩৬।
[৩৬]. পুর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ১৯৪।
[৩৭]. শহীদুল্লা কায়সার, সংশপ্তক, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮২, ঢাকা, মুক্তধারা, পৃ:১৬৩।
[৩৮]. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৫-১৯৬।
[৩৯]. শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, কাশবনের কন্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ওসমানিয়া বুক ডিপো,ঢাকা, ১৩৬৪,পৃ: ৭৭-৭৮।
[৪০]. পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৯।
[৪১]. মনসুর মুসা, পূর্ববাংলার উপন্যাস, ১৯৭৪, ঢাকা, পূর্বলেখ প্রকাশনী, পৃ: ৭৮।
[৪২]. আলমনগরের উপকথা, দ্বিতীয় প্রকাশ, কহিনূর লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৩৭১, পৃ: ৫।
[৪৩]. পূর্বোক্ত,পৃ: ৭৮।
[৪৪]. পূর্বোক্ত,পৃ: ৭৪।
[৪৫]. পূর্বোক্ত,পৃ: ২১৫।
[৪৬]. পূর্বোক্ত,পৃ: ২১৪-২১৫।
[৪৭]. আবু ইসাহক, সূর্য-দীঘল বাড়ি, ত্রয়োদশ মুদ্রণ-১৯৮৮, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, পৃ: ৯।
[৪৮]. পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

[৪৯]. পূর্বোক্ত, পৃ: ২২।

[৫০] পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৪।

[৫১]. পূর্বোক্ত, পৃ:১২৭।

[৫২]. পূর্বোক্ত, পৃ:৯৮।

[৫৩]. পূর্বোক্ত, পৃ:১৪৭।

[৫৪]. পূর্বোক্ত, পৃ:১৫১।

[৫৫]. আহমদ ছফা, সূর্য তুমি সাথী, চতুর্থ মুদ্রণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৩৯৯,পৃ: ৫৩।

[৫৬]. পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৭।

[৫৭]. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৩।

[৫৮]. পূর্বোক্ত, পৃ:৭২-৭৩।

[৫৯]. পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের অধিকাংশ উপন্যাস শ্রেণী বিভক্ত, শোষণমূলক সমাজ কাঠামোতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামশীল মানুষের বহুমুখী চেতনার শিল্পরূপ। ১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় বাংলাদেশের জনজীবনে যে আলোড়ন, বিবর্তন ও সংগ্রাম সূচিত হয় এ সময়ে রচিত উপন্যাসে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচিত সাতজন ঔপন্যাসিকের চেতনা ও সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় রূপায়ণের মধ্য দিয়ে তার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা থেকে সমাজে বিদ্যমান শ্রেণী অস্তিত্বের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ, সংঘাত ও শ্রেণীসংগ্রাম রূপায়ণের মাধ্যমে তাঁরা আমাদের সমাজের প্রচলিত শ্রেণীগত জীবন-সত্যকে সামনে এনেছেন।

গবেষণাকর্মের আলোচিত উপন্যাসসমূহের বিশ্লেষণ থেকে আমরা দেখতে পাই, বিভাগোত্তর সদ্য স্বাধীন দেশে নতুন রাজধানী শহর গড়ে ওঠার পটভূমিতে দেশের কয়েক হাজার পশ্চাৎপদ গ্রামে বসবাসরত মানুষের জীবনবাস্তবতার শিল্পিত প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক মীমাংসা, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভ্যন্তরে যে শ্রেণীসংগ্রামের উপাদান কাজ করে এসেছে, মিশ্রিতভাবে বাংলাদেশের উপন্যাসে সে সবের প্রতিফলন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সত্যেন সেন, শহীদুল্লা কায়সারের উপন্যাসসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের উপন্যাসে শ্রেণীচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ শীর্ষক অধ্যায়ে উক্ত ঔপন্যাসিকদ্বয়ের উপন্যাস আলোচনায় তা বিশ্লেষিত হয়েছে। এছাড়া গবেষণাকর্মে আলোচিত অপর পাঁচজন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সরদার জয়েন উদ্‌দীন, শওকত ওসমান, আহমদ ছফা প্রমুখের লেখায়ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল শ্রেণীচেতনার উপাদান কমবেশি প্রভাব রেখেছে। তাঁদের উপন্যাসে প্রতিফলিত জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম আন্দোলনের দৃষ্টান্ত হিসেবে কৃষক আন্দোলন, সাময়িক সংগঠন, শ্রমিক আন্দোলনের কথা বলা যায়।

আলোচিত উপন্যাসগুলোর জীবনচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজের নিম্নবিত্তের মানুষেরা নিজেদের শ্রেণী অবস্থান, সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে বিকল্প পথ অন্বেষণ করেছে; যেমন, গ্রাম থেকে তারা নগরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু নতুন শ্রেণী সংগ্রামের সংগঠিত উদ্যোগ তারা প্রায়শই নিতে পারেননি। আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসে জয়গুনের গ্রাম ত্যাগ সে সত্যেরই পরিচয় বহন করে। অস্তিত্ব বিনাশী আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় জয়গুন পরিবারের সংগ্রাম ও গ্রাম ত্যাগের কাহিনী নবযাত্রার সম্মুখভূমিতে মীমাংসাহীন অন্ধকার ও শূন্যতাকেই যেন একমাত্র গন্তব্যরূপে স্পষ্ট করে তোলে।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ উপন্যাসের ক্ষেত্রেই শ্রেণী-সংগ্রামের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক', সরদার জয়েন উদ্‌দীনের 'আদিগন্ত', 'অনেক সূর্যের আশা', শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের 'আলমনগরের উপকথা' উপন্যাসে শোষণহীন সমাজগঠনে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ এবং আহমদ ছফার 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসে সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের সম্ভাবনা ও শোষণহীন সমাজগঠনের ইঙ্গিত উল্লেখ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমান ও আবু ইসহাক শ্রেণী-অস্তিত্বের স্বরূপ উপস্থাপনে সমাজজীবনের বাস্তব প্রচ্ছদ তুলে ধরেছেন। আবু ইসহাকের উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে বাস্তব চরিত্র পাত্র আর শওকত ওসমান রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে বাস্তবতার সীমা স্পর্শ করেছেন।

শ্রেণীবিভক্ত, শোষণমূলক ও ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামোতে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও ঘটনা, ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনকে কিভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত করে, তাকে সত্যেন সেন নির্মোহ পর্যবেক্ষণে রূপদান করেছেন। তাঁর উপন্যাসে মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে জাতীয় মানবপরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং একটি শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি ব্যক্ত হয়েছে।

গ্রামসমাজের শোষণ এবং শোষিতের সামাজিক অবস্থান সরদার জয়েন উদ্‌দীনের উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরদার জয়েন উদ্‌দীনের প্রতিনিধিত্বকারী উপন্যাস 'অনেক সূর্যের আশা'। উপন্যাসটিতে শোষণহীন শ্রেণীবৈষম্যমুক্ত সমাজপ্রতিষ্ঠার আশাবাদের মধ্য দিয়ে শ্রেণীচেতনার অন্তর্নিহিত স্বরূপ প্রকাশিত। গ্রন্থ প্রকাশের ক্রম হিসেবে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক জীবনধারার ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসে স্বভাবতই শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণের আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে। তবে শ্রেণীসংঘাত ও সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস অন্বেষণে গভীর ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও তাঁর জীবনদৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ নয়। তার উপন্যাসে প্রতিফলিত আশাবাদের মধ্যে দেশ বিভাগোত্তর বাঙালি মুসলমানের মনোবাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিক জীবনান্বেষার মৌলিক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বিভাগোত্তর কাল অর্থাৎ ১৯৫১ পর্যন্ত প্রায় এক যুগের বাঙালির জীবনসত্য শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। আমরা দেখি, 'সংশপ্তক' উপন্যাসের শেষাংশে সমাজতন্ত্রী নেতা জাহেদ গ্রেপ্তার হবার পর সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে, "আমি আসব।" তাঁর এই উক্তি ভবিষ্যত সংগ্রামের আশাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। এভাবে সমাজ সময়ের প্রতিরূপে গণমানুষের মুক্তির বাণীতে শ্রেণীচেতনা বিষয়টি 'সংশপ্তক' উপন্যাসে মহাকাব্যিক অবয়ব লাভ করেছে।

শ্রেণীচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আহমদ ছফার প্রতিনিধিত্বকারী একটি মাত্র উপন্যাস 'সূর্য তুমি সাথী' আলোচিত হয়েছে। হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসেবে নয়, শোষক ও শোষিত শ্রেণীভুক্ত করে তিনি এ উপন্যাসটিতে সমাজসত্যের তাৎপর্যময় রূপ উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসটিতে নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চতর শ্রেণীর ঘৃণা ও নির্যাতন, মাতব্বরের স্বার্থপরতা ও নিপীড়ন এবং কৃষককর্মীদের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণকে সংগঠিত ও শ্রেণীসচেতন করার উদ্যোগ–এ সবকিছুই একটি সামগ্রিক চেতনার আলোকে 'সূর্য তুমি সাথী' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণাকর্মের 'শ্রেণীচেতনা' বিষয়টি যেহেতু শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে সমর্থন করে, সেহেতু গবেষণাকর্মের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'শ্রেণীচেতনা' বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে গবেষণার আলোচনায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কস ও লেনিনের তত্ত্বের কথা এসেছে। পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের অপরাপর তাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার এবং মার্কসীয় তাত্ত্বিক গ্রামসি এবং অন্য বহু তাত্ত্বিকের তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সে তত্ত্ব গবেষণার আলোচিত বক্তব্যের মধ্যে রয়ে গেছে প্রচ্ছন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলব, বিভাগপূর্ব সামন্ত সমাজ কাঠামো এবং বিভাগোত্তর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার রূপান্তরের কারণে আমাদের সমাজব্যবস্থায় যদিও কিছু কিছু রদবদল হয়েছে, রাষ্ট্রও বদলেছে, কিন্তু পীড়িত মানুষের দুর্গতি কমেনি। নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ করেছে, রুখে দাঁড়িয়েছে, অভ্যুত্থান পর্যন্ত ঘটিয়েছে। তাতে ওপরে ওপরে পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু দুর্বল মানুষ মুক্তি পায়নি প্রবলের জুলুম থেকে। উক্ত বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশের সমাজজীবনের মৌল শ্রেণীগত দ্বন্দ্বে সমাজের নানা শ্রেণীর জীবন বাস্তবতা, বিভিন্ন শ্রেণী অস্তিত্বের বস্তুগত ও চেতনাগত বৈষম্য এবং শ্রেণীগত জীবন অন্বেষা, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তার ঐতিহ্যবোধ ও ইতিহাসচেতনা, স্বদেশচেতনা কিভাবে সমগ্র জনসাধারণ ও নিজেদের মুক্তিপথ নির্দেশনায় ভূমিকা রেখেছে, সেসবই মূলত শ্রেণীচেতনার পরিচয় রূপে ১৯৪৭-১৯৭১ কালপর্বে আলোচিত উপন্যাসসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর এরই একটি সামগ্রিক কিন্তু সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন উপরিউক্ত আলোচনায় উপস্থাপিত হল।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

➲ মৌলিক গ্রন্থ

সত্যেন সেন :

১. পদচিহ্ন, আশ্বিন ১৩৭৫, কালিকলম প্রকাশনী, ৬৪, চাঁনখার পুল লেন, ঢাকা।
২. সাত নম্বর ওয়ার্ড, শ্রাবণ ১৩৭৬, সাহিত্য বুক ডিপো, চরকুতুব, ঢাকা।
৩. উত্তরণ, ১৯৭০, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৭, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।
৪. সেয়ানা, আশ্বিন ১৩৭৫, প্রকাশ ভবন, ৫, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।
৫. মা, পৌষ ১৩৭৭, স্বদেশ প্রকাশনী , ঢাকা –১।
৬. অভিশপ্ত নগরী ,বৈশাখ , ১৩৭৪, পুঁথিপত্র প্রকাশনী , ঢাকা–১।
৭. পাপের সন্তান , ১ মে ১৯৬৯ , নওরোজ কিতাবিস্তান , ৪৬ বাংলা বাজার ,ঢাকা– ১।
৮. বিদ্রোহী কৈবর্ত , ১১ আশ্বিন ১৩৭৬ , খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি , ৬৭ প্যারিদাস রোড , ঢাকা –১ ।
৯. পুরষমেধ, ১৯৬৯, সুচয়নী, ঢাকা।

শওকত ওসমান :

১. জননী, ঢাকা বুকস, ঢাকা, ১৯৬১।
২. রাজা উপ্যাখান, ১৩৭৭, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।
৩. ক্রীতদাসের হাসি, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৩, ঢাকা, মুক্তধারা।
৪. চৌর সন্ধি , শওকত ওসমান উপন্যাস সমগ্র, ১ম খন্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, ২০০১।
৫. বনি আদম, শওকত ওসমান উপন্যাস সমগ্র, ১ম খন্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২য় মুদ্রণ, ২০০১।

সরদার জয়েন উদ্‌দীন :

১. আদিগন্ত, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৩৬৩।
২. 'অনেক সূর্যের আশা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৪, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান।

শহীদুল্লা কায়সার :

১. সারেং বৌ, পূর্ববাণী, ঢাকা, ১৯৬২।
২. সংশপ্তক, পূর্ববাণী, ঢাকা, ১৯৬২।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম :

১. কাশবনের কন্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৩৬৪।
২. আলমনগরের উপকথা, দ্বিতীয় প্রকাশ, কোহিনূর লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৩৭১।

আবু ইসহাক :

১. সূর্য দীঘল বাড়ি, প্রকাশক, ইনায়েত রসূল, ৪৩, দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪, ১৯৬২।

আহমদ ছফা :

১. সূর্য তুমি সাথী, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, ৪র্থ মুদ্রণ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ↄ সহায়ক গ্রন্থ

অনুপম সেন, বাংলাদেশঃ রাস্ট্র ও সমাজ, ঢাকা, সাহিত্য সমবায়, ১৯৮৮।

অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সংস্কৃতির ভাঙ্গাসেতু, কলকাতাঃ নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭।

আবুল কাশেম ফজলুল হক, উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৮।

আজিজুর রহমান, দ্য ইকনমি অব বাংলাদেশ, গ্রেট বৃটেন, ম্যাকমিলান, ১৯৭২।

আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, তৃতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৩।

আহমদ কবির, সরদার জয়েন উদ্‌দীন (জীবনী গ্রন্থমালা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।

আহমদ ছফা, বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৭২), তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭, ঢাকা, মুক্তধারা।

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮।

জ. বেরবেশকিনা, দ. জেরকিন, ল. ইয়াকভেলেভা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?, বাংলা অনুবাদঃ দ্বিজেন শর্মা, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮।

ধনঞ্জয় দাশ, সম্পাদক, বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনা ধারা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯২।

নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩।

বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম ও ৩য় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৫।

বদরুদ্দীন উমর, মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৮৬।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১।

বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদক, সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭।

মহীবুল আজিজ, বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২।

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী, আমাদের উপন্যাসে বিষয় চেতনাঃ বিভাগোত্তর কাল, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

মনসুর মুসা, পূর্ব বাংলার উপন্যাস, ১৯৭৪, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা।

রনেশ দাশ গুপ্ত, উপন্যাসের শিল্পরূপ, তৃতীয় সংস্করণ, কালিকলম প্রকাশনী, ১৯৭৩, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রনেশ দাশ গুপ্ত, আয়'ত দৃষ্টিতে আয়'ত রূপ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।
রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
সত্যেন সেনের উপন্যাস-বিষয় স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প চেতনা, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।
শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০।

সরোজ বন্দোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সাহিত্যশ্রী, ১৯৭১, কলকাতা।

সাঈদ-উর রহমান, মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা, একাডেমিক পাবলিশার্স, ৩, কলেজ স্ট্রীট, ধানমন্ডি, ঢাকা, ১৯৮৬।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শ্রেণী সময় ও সাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮৬।

সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৬, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলাদেশের উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ ও শিল্প জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ঢাকা।
বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

➲ প্রবন্ধঃ

অমলেশ ত্রিপাঠী, 'স্বাধীন ভারত সমস্যা, সাফল্য, ব্যর্থতা, সম্ভাবনা', দেশ, ৫৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা সম্পাদক, সাগরময় ঘোষ, ১০ আগস্ট, ১৯৯১, কলকাতা।
বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘঃ পটভূমি ঢাকা', বাংলা একাডেমী।
বাংলাদেশের সাহিত্য, ১৯৯১, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।
যতীন সরকার, 'সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস' গণ সাহিত্য, (সম্পাদকঃ আবুল হাসনাত), অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ-ষষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৮৬, ঢাকা।
রণেশ দাশগুপ্ত, 'বিপ্লবী নয়া ধ্রুপদী গণ-কথা শিল্পী সত্যেন সেন', আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ, ১৯৮৬, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন।